ওপারে ঘনশ্যাম তরুরাজির ফাঁকে ফাঁকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র; এপারে ঠিক নদীর কিনারেই বসে হাট। যায়গাটার নাম রথতলা। গ্রামটা খুব বড় না হলেও বহু বিচিত্র জীবনে আকীর্ণ—বহু সুখ-দুঃখে কল্লোলিত—বহু আধিব্যাধিতে আক্রান্ত। বর্ণ-হিন্দু বাসিন্দার বস্তিই বেশি কিন্তু মুসলমানও আছে অনেকগুলি; তা ছাড়া জেলে, কৈবর্ত্ত, মুচিও আছে, আর আছে কয়েক ঘর যাযাবর সাঁওতাল গ্রামের একেবারে উত্তর-প্রান্তের শালবনটার কোল ঘেঁসে। নিজেরাই ঘর তৈরী করে নিয়েছে, নিজেরাই হয়তো কোনো একদিন ভেঙে-চুরে দিয়ে কোথায় চলে যাবে।

মাঝের নদীটি বর্ষার জলে যখন ফুলে ওঠে তখন ওপারের শস্যক্ষেত্র ডুবে যায়—এ পারের গ্রামেও অনেকের ঘরবাড়ী ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার নদীর জল কমলেই যে-যার আস্তানা ঠিক করে নেয়। বহু কালের বাসিন্দা এরা—তাই এখান থেকে কেউ উঠে যাবার কল্পনা খুব করেনা।

বোরেগী পাড়াটাই ডোবে বেশি! যায়গাটার জমি নীচু আর গরুর গাড়ীচলা রাস্তাটির গর্ত দিয়ে, নদীর জল প্রথমেই এসে আক্রমণ করে এদের, বোরেগীরা তাই নদী সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজাগ। একবার চাঁদা তুলে এরা নদী-কিনারায় একটা বাঁধ তুলবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু গ্রামের আর সব পাড়া অতটা বিপন্ন নয় বলে চাঁদা আশানুরূপ উঠে নাই, কাজেই

বাঁধও তৈরী হয় নাই। খানিকটা মাটি কাটা হয়ে ঢিবি হয়ে অ
বৈরাগীর ঘরের কাছে ;—সে ঢিবিটায় এখন বড় বড় জায়গা
গেছে !

সুদাসের ভিটেটাই বন্যার প্রথম আক্রমণ সহ্য করে। মাটির
বহুদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত—বাড়ীটা পাকা—গাঁথুনি সেকা
মশলার। ঘরের দেওয়াল প্রায় দুহাত চওড়া—কাজেই এখ
আছে, তবে, এবারের বর্ষায় বুঝি আর টেকানো যায় না !
পূর্বদিকে গৌরাঙ্গমন্দির—সবটাই পাথরের তৈরী। খুবই শক্ত
মন্দির—সেটাও কিন্তু এবার জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সুদাস দাঁড়িয়ে
তাই দেখছিল।

ওর হাতের মালাটা ঠিক ঘুরে চলেছে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
······ইত্যাদি কথাগুলো মুখের ভেতর থেকে শব্দের রূপ পেযে
না—তাই গলার শিরাগুলো কাঁপছে। পেতলে' রংএর চোখদুটো
গৌরাঙ্গমূর্ত্তির দিকেই তাকিয়ে। অকস্মাৎ সুদাস একটা নিশ্বা
বলে উঠলো—তোমারই ইচ্ছা প্রভু !

মন্দিরটার দক্ষিণে ছোট্ট একটা বাগান—কয়েকটা ফুলের গা
পর প্রকাণ্ড একটা তমালগাছ, তারপরই নদীর ভাঙন আরম্ভ
তমালগাছটা এবার আর টিকবে বলে মনে হয় না। ঐ বিরাট ব
এতকাল বানের জল ঠেকিয়ে রেখেছিল, এবারে ও জীর্ণ হয়ে
মৃত্যুর ইঙ্গিত জেগেছে ওর শেকড়ে শেকড়ে। সুদাসেরও দেহে
শিরায়-শিরায় জেগেছে সেই একই ইঙ্গিত। কিন্তু তমালগাছট
জলে ভেসে যাবে ঝুলন পূর্ণিমার আগেই হয়তো—সুদাস কি তা
যেতে পারবে ? গেলে ভাল হয়। এই সাতপুরুষের ভিটে আর
মূর্ত্তি ভেসে যাবার আগেই সুদাস যেন চলে যেতে পারে···সুদা
থলিটা কপালে ঠেকিয়ে ডাকলো—বৌমা !

—যাই বাবা……ঘরের ভেতর থকে সাড়া দিল গানের মত মিষ্টি একটি কণ্ঠস্বর। সুদাসের বিধবা পুত্রবধূ—নাম মিলনরাখী—'রাখী' বলেই সবাই ডাকে, শুধু সুদাস একাই বলে 'মিলন'। বছর কুড়ি বয়সের মেয়ে—অনবদ্যাঙ্গী। দেখলে মনে হয়—গ্রামলক্ষ্মী!

সদ্য স্নান করা ভিজে চুল গুলো পিঠে ফেলে ও বেরিয়ে এল ঘর থেকে উঠোনে। পরণে গ্রামের তাঁতীঘরের তৈরী নীল্ছে রংএর চওড়াপাড় শাড়ী—তাতেই যেন শ্রীরাধার মত দেখাচ্ছে! হাতে কয়েকটা বাসন—মন্দিরের পূজোর আস্বাব্, মেজে-ধুয়ে এনেছে! সুদাস দেখলো—নির্নিমেষ হয়ে দেখতে লাগল বৌটাকে। সলজ্জ নতমুখে বৌটা বলল,—

—আজ হাটবার বাবা, হাটে যাবে না?

—হুঁ—যেতে হবে—যাই; কি কি আনবো মা?

—তরকারী কিছু নাই বাবা…ঝিঙে, কুমড়ো যদি পাও, আর না হয়, শাকপাতা যা পাও……

—দাও, পয়সা দাও কিছু, দেখি!

আঁচলের খুঁট থেকে পয়সা খুলে দিতে দিতে বৌটা বলল বিমর্ষকণ্ঠে,—তোমার গা' ভালো আছে তো বাবা! কোমরের ব্যথাটা? না হয় তো থাক হাটে যাওয়া।

—হ্যা মা, ভালোই তো আছে! দে পয়সা—যাই আস্তে আস্তে।

হাত পেতে পয়সাগুলো নিয়ে সুদাস লাঠিহাতে চলতে লাগল। কুঁজিয়ে হাটে—অতি আস্তে চলতে হয়। বার্দ্ধক্য ওকে আর সোজা হতে দিতে চায় না—মনের বার্দ্ধক্য হয়তো আরো বেশি ওর! বৌটা দেখলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল সুদাস। যেতে ওর মন ছিল না, বৌটা জানে, কিন্তু না গেলেও তো চলে না। শুধুভাত আর দেওয়া চলে না শশুরের মুখের সামনে। খেতে পারে না

সুদাস—দু' গ্রাস খেয়েই উঠে যায়—বলে—খুব খেলুম বেটা—তুই এবার খা দেখি ছুটো !

বাড়ীর উঠানে শাকপাতা অনেক রকম লাগায় বৌটা কিন্তু তার উপর নির্ভর করে সংসার চালানো যায় না। তাছাড়া এ বছর বোশেখ জ্যৈষ্ঠ মাস খুব খরা গেছে—গাছপালা তেমন জন্মায় নাই। চার পাঁচ দিন তরিতরকারীর বড়ই অভাব চলছিল ! একটা মাত্র গাই গরু আছে, বিয়োবে সেই ফাগুন মাস নাগাদ—তখন একটু দুধ হবে—বৌটা সেই আশায় দিন গুণছে !

হাতের বাস্নগুলো মন্দিরের মধ্যে রেখে সাজিটা নিয়ে ও বাগানে নামলো ফুল তুলতে। সুদাস এসে স্নান করে পূজো করবে ! সব আয়োজন বৌ আগেই করে রাখবে, কারণ হাট থেকে বুড়োমানুষের ফিরতে দেরী হওয়া স্বাভাবিক। ওদিকে রান্নাও সময়মত না করলে অবেলায় সুদাস কিছুই খেতে পারবে না।

ফুল তুলতে তুলতে বৌটা তমালগাছের দিকে তাকাল—বহু কালের গাছ—ওর শ্বশুরের বাবার বাবা নাকি পুঁতেছিলেন। কত দীর্ঘকাল থেকে ঐ গাছটি এবাড়ীর সমৃদ্ধি এবং ধ্বংসের সাক্ষী ! এবার ও হয়তো যাবে। ওর গোড়ার মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে জীবনগ্রন্থী শিথিল করে দিয়েছে। কিন্তু ওর তলায় আছে যে অমূল্য বস্তুটি—সেটিও যাবে তো ? হ্যাঁ যাবে ! সর্ব্বগ্রাসী হিঙ্গুলা কাউকে রেহাই দেবে না—ঐ শেষ সম্বলটুকুও নিয়ে যাবে—নিয়ে যাবে এই বছরই !

সেই অমূল্য বস্তুটির মূল্য সম্বন্ধে বৌটি ততখানি সচেতন [illegible] যতখানি সচেতন সুদাস। সুদাসের কথা ভেবেই ও এতটা চিন্তিত হয়ে উঠেছে, নইলে হয়তো ওদিকে ও তাকাতোও না ! বস্তুটি ছোট্ট একটি ইটের স্তূপ, —সুদাসের একমাত্র পুত্রের,—এই বৌটির স্বামীর সমাধি।

নরোত্তম যখন আঠারো বছরের তখুনি সুদাস দেখে-শুনে পছন্দ করে ঘরে এনেছিল এই বৌটিকে—অনেক টাকা খরচ করে, অনেক ধুমধাম করে

ঢোল-কাঁসি-সানাই বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে সুদাস বৌ এনেছিল। একমাত্র পুত্রের বৌ, মাতৃহারা পুত্র—রূপবান এবং গুণবান পুত্র। সম্পত্তিশালী সুদাসের সেদিনের আনন্দের ঢেউ সেই শ্রাবণ-রজনীতে হিজুলার প্রমত্ত ঢেউএর থেকে কম ছিল না। মিলন তখন মাত্র এগার বছরেরটি। তারপর গেল আরো চারটা বছর—মিলন দুচার দিন বাপের বাড়ী থেকে আসে—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই থাকে শ্বশুরের কাছে। নরোত্তম তখন হেতমপুরের কলেজে পড়তে গেছে। খুকী-বৌ মিলনের সঙ্গে ভাবসাব তখনো হয়ে ওঠেনি ওর! হঠাৎ একদিন জ্বর নিয়ে নরোত্তম বাড়ী ফিরলো; ডাক্তার বলল—টাইফয়েড—বয়সটা খারাপ, খুব সাবধান!

তিনখানা লাঙ্গলের ধানী জমি—আলুর ক্ষেত, আখের ক্ষেত, কপির ক্ষেত ঐ দুরন্ত রোগের চিকিৎসায় গ্রাস করে নিল—রইল শুধু বাস্তু এই ভিটে আর বিঘে সাত-আট ধানী জমি—ঠাকুরের সম্পত্তি; বেচবার উপায় নাই, তাই রয়ে গেল।

সমাধি, শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকাতে মিলনের গায়ের গয়নাগুলোও গেল—মিলনের বেশ মনে আছে। হোক না পাঁচ বছরের কথা—মিলনের মনে পড়ে, শ্যামল রংএর সেই একটা বলিষ্ঠ দেহ—লম্বা চুল—ঐ তমাল গাছটার ডাল ধরে দোল খেতো আর ছড়া গাইত :—

বৃন্দাবনে দেখে এলাম—শ্রীযমুনার কাছে লো
কালো মেঘের কোলটি জুড়ে বিজলতা আছে লো…!

আরো অনেকটা গাইতো, মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে চাইতো মিলনের পানে—মিলন গ্রাহ্য করতো না—চলে যেত। তখনো গ্রাহ্য করবার মত বয়স ওর হয়নি। দু-একবার আদর হয়তো করেছিল সেই ছেলেটা—ভাল মনে পড়ে না মিলনের—তবে একটা দিনের মা'র খাওয়ার কথা মনে আছে! বৈষ্ণবের বাড়ীতে মাংস-ডিম প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু হেতমপুর থেকে এক ছুটিতে এসে ঐ ছেলেটা দুটো হাঁসের ডিম এনে

দিয়েছিল লুকিয়ে মিলনের হাতে, বলেছিল—'বড়া ভেজে দাও—বাবা যেন জানতে না পারে।' মিলন ডিম দুটো নদীর দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—'ওমমা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ'—তারপর তাড়াতাড়ি হাত ধুতে যাবে,—ছেলেটা চটাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল ওর গালে—তারপর চলে গিয়েছিল বাইরে! চড়টা খুব লেগেছিল মিলনের—মনে আছে!

এর কিছুদিন পরেই আবার ফিরে এল জ্বর নিয়ে—সেই ফেরাই শেষ ফেরা—আর যায়নি—আছে ঐ তমাল গাছের তলায়, ঘুমুচ্ছে! সেই পাঁচ বছর আগে যেদিন পাড়ার লোক সব এসে গর্ত্তখুঁড়ে ওকে ঐখানে রাখলো—আর সুদাস মিলনকে কোলে জড়িয়ে নদীর ধারার মত চোখের জল ফেলতে লাগলো—সেদিন সবারই দেখাদেখি মিলনও কেঁদেছিল—কিন্তু কাঁদবার কারণটা কতখানি গভীর, তা তখন বোঝেনি—এই পুরো পাঁচটা বছর ধরে কিন্তু বুঝে আসছে! সেই চড় খাওয়াই ওর শেষ কথা স্বামীর সঙ্গে—সেই ডিম ভেজে না দেওয়াই শেষ অপরাধ। বৈষ্ণবের ছেলের ডিম খেলে অকল্যাণ হবে—ভেবেই মিলন ভেজে দেয় নি—কিন্তু চরম অকল্যাণ হয়ে গেল। ডিম ভেজে দেবার আর অবসরও মেলেনি না। রোগে পড়ে নরোত্তম লোক চিনতে পারত না—ক্রমাগত ভুল বকতো, কাজেই চড় খাওয়াটাই শেষ কথা!

সমাধিটুকু সুন্দর করে বাঁধিয়েছে সুদাস। ছোট্ট একটি কুলুঙ্গী আছে ওর গায়ে। রোজ সেখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে হয় মিলনকে। গৌরাঙ্গের সন্ধ্যাপূজা শেষ করে সুদাস অনেকক্ষণ ঐখানে বসে থাকে—চুপচাপ বসে থাকে! তমালগাছের সঙ্গে সমাধিটাও যাবে—সুদাস তাহলে আর বাঁচবে না—সুদাস ঐ সমাধিকেই তার ছেলে মনে করে। ভালো কিছু মিলন রান্না করলে ঐখানে নিয়ে গিয়ে বলে—খা নরু—খা বাবা আমার!

মিলন বুঝতে পারে—ঐ রকম করা তারও উচিৎ ছিল, কিন্তু ওরকম করবার মত কোনো আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগে না তার। স্বামীকে

অতখানি ভালো বাসলো কখন সে! স্বামী মারা যাবার পর ওর বাপের বাড়ী থেকে লোক এল ওকে নিতে, সুদাস পাঠালো না—বলল,

—আমার সব গেছে, শুধু আছে মিলন—ওকে কেড়ে নিও না!

ওরাও তাই নিয়ে যায় নি! সুদাস নিজে মিলনকে লেখাপড়া শেখাতো—গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত পড়িয়েছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাসের পদাবলী, এমন কি বিদ্যাপতির দোঁহা আর মীরাবাঈএর ভজন মিলন ভালই গাইতে পারে। এই দীর্ঘ পাঁচ বছর সুদাস ঐ নিয়েই আছে। মিলন বোধ হয় গ্রামের সেরা বিদুষী। না—মিলন সেরা বিদুষী নয়—মনে পড়ে গেল—রায়বাবুদের বৌ এসেছে, কলকাতার মেয়ে—বি, এ, পাশ—সেই এখন সেরা বিদুষী এ গাঁয়ে। তা হোক—মিলনের সেরা বিদুষী হবার কিছু তো দরকার নাই আর!

হাঁ—দরকার নাই। কী হবে আর ওসবে! কোন্‌বা কাজে লাগবে! তার চেয়ে এই মহাজনী পদাবলী, চৈতন্য চরিতামৃত, দোহাবলী, শ্রীগীত-গোবিন্দ—এইগুলোই ভালো করে পড়লে অনেক কাজ দেবে। পরকালের অনেক পাথেয় সঞ্চিত হবে। মিলন মন দিয়ে তাই পড়ে, আর পড়ে মীরার জীবনেতিহাস। বড় ভাল লাগে ওর। গিরিধারীলালকেই বিয়ে করে বসল মেয়ে! চমৎকার! রাজা স্বামী পড়ে রইল কোথায়—মীরা চলে গেল বৃন্দাবন! মীরার জীবনের প্রত্যেকটি কথা মুখস্থ করেছে মিলন। মীরার নামের সঙ্গে নিজের নামের সামঞ্জস্য খোঁজে ম-এ ম-এ মিল দেখে। মীরা যদি অমন হতে পারে তো মিলনইবা কেন পারবে না!

কিন্তু সুদাস মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সুদাস বলে—'আমাদের বোষ্টমের ঘর। মালাচন্দন করে তোমার আবার আমি বিয়ে দেব মা মিলন'—কথাটা শুনে চুপ করেই থাকে মিলন—কিন্তু মনের ভিতর বড্ড গোল বেধে যায়। আগে বাধতো না—কারণ বছর তিন আগে ঐ সুদাসই একদিন মীরাবাঈয়ের চরিত্রকথা বলতে বলতে মিলনকে

বলেছিল—'তুমিও ঐ গৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে মালা দাও'—দিয়েও ছিল মিলন ঐ মূর্ত্তির গলায় মালা। সুন্দর সুচারু মূর্ত্তি—কী আকর্ণ বিস্তৃত দুটি চোখ—কী অপূর্ব্ব হাসিটি ঠোঁটে! অমন বর কে আবার না চায়? খুব দিনকতক ঐ মূর্ত্তির ধ্যান করে কেটেছিল মিলনের—এখনও ধ্যান করে কিন্তু কেমন যেন আবেগ আসে না আর—যেন মিইয়ে গেছে মনের সেই অদ্ভুভাবটি। সুদাস বলে—"তোমার আবার আমি বিয়ে দেব বৌমা—" বলে, কিন্তু কোনো উদ্যোগ তো করে না! মিলনকে ভালবাসে সুদাস—খুবই ভালোবাসে—এতো ভালবাসে যে অতখানি ভালোবাসা আর উচিৎ নয়। মিলন এখন সুদাসের মা আর মেয়ে একসঙ্গে। কিন্তু বিয়ে সুদাস দেবেনা—মিলন বেশ বুঝতে পারে এখন। বিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছেই সুদাসের নেই, শুধু মুখে বলে! ওরকম করে বলার যে কি দরকার! খামোখা মন খারাপ করে দেওয়া। মিলনকে যে সুদাস কেন এত ভালবাসে, তা বোঝে মিলন—সে ঐ ছেলেটার জন্য। মিলনকে সুদাস ঐ ছেলেটার প্রতিনিধি করে রেখেছে। ওর ঐ ক্রোড়দেবতার প্রতিমূর্ত্তি করে রেখেছে—ছাড়তে চায় না—এমন কি, ঐ ছেলেটার বদলে আর কেউ এসে মিলনকে চড় মারবে—তাও চায় না—মিলন এটা ভালোই বোঝে—তাই চুপ করে থাকে। মিলন লক্ষ্য করেছে, ঐ সমাধিতে দেওয়া প্রদীপটা একদিন না মাজা হলে সুদাস খুঁৎ খুঁৎ করে—প্রতিদিন প্রদীপটা সকালেই তাই মেজে ধুয়ে রেখে দেয় মিলন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ঐ থানে প্রদীপ দিতে ওর ভয় ভয় করে—মনে হয়, এবে বুঝি আবার একটা চড় কষে। মিলন তাই বেলা থাকতেই জেলে দিয়ে আসে প্রদীপ।

ফুল কটা সাজিতে ভরে মিলন মন্দিরে ঢুকে তাকালো মূর্ত্তির পানে। পরম সুন্দর মূর্ত্তি, দুটি চোখে ভাব-নিবিড় কাব্য ভেসে রয়েছে যেন—মিলন চেয়ে রইল।

সুদাসের বাড়ীর পূর্বদিকেই গরুরগাড়ী চলার রাস্তা—একেবারে নদীতে গিয়ে পড়েছে। রাস্তাটা খুব নীচু—বানের জল এই নীচু রাস্তা দিয়েই প্রথম গ্রামে ঢোকে, তাই প্রথম বাধাস্বরূপ ঐ রাস্তার শেষপ্রান্তে নদীর কোলঘেঁসে বাঁধ তৈরী করা হচ্ছিল—সে বাঁধ শেষ হয়নি—মাটির একটা উঁচু ঢিবি হয়ে আছে। তাতে নানারকম আগাছার জঙ্গল আর কাশবন জন্মে গেছে। একজোড়া নাকি দুধে-খরিশ সাপও বাস করে ওখানে। তবু কিন্তু ঐ ঢিবিটার উপর দিয়ে গরুর গাড়ী পার করে নদীতে নামতে হয়। ঐ বাঁধটা শেষ হলে সুদাসের বাড়ী হয়তো আরো দশ-বিশ বছর নিরাপদ থাকতো—কিন্তু গাঁয়ের লোক চাঁদা দিল না। ইউনিয়ন বোর্ড লক্ষ্য করলো না—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ খবর পেলেন না।

গাড়ীচলা রাস্তাটা গ্রামকে দুভাগ করেছে—পূর্ব্বপাড়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি সভ্য জাতের পাড়া, আর পশ্চিম পাড়া, মানে এই তিলি, তামুলি বৈরাগী, বাউরী, বাগদী, সাঁওতালদের পাড়া। সভ্যপাড়ার সকলকেই কিন্তু এই পশ্চিম পাড়ায় আসতে হয়—ওদের জমি চাষ করবার জন্য—ওদের ঘরদোর ছাওয়াবার জন্য—ওদের জনমজুর খাটাবার জন্য এ পাড়ায় না এসে ওদের গতি নাই, তথাপি কিন্তু এ পাড়াটা বানের জলে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে—ওরা গ্রাহ্য করলো না। ইউনিয়ন বোর্ড ওদেরই পাড়ায়—ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের পাঠশালা, সবই ওরা নিজেদের পাড়ায় করেছে আর প্রত্যেকটির জন্য এদের কাছে চাঁদা আদায় করেছে, কিন্তু বানের জলে বিপন্ন এ পাড়াটার জন্য ওরা একটি পয়সা চাঁদা দিল না; আশ্চর্য্য!

এই তো চার পাঁচ বছর আগে যখন ওরা দাতব্য চিকিৎসালয় খুললো তখন সুদাসকে পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে। ছেলেটা তখনো বেঁচে।

সুদাস খুশী মনে চাঁদা দিয়েছিল। সেই বছর সুদাসের কপাল ভাঙল—, হ্যাঁ—সেই বছরই।

ভাবতে ভাবতে চলছিল সুদাস। ঐ পাড়াতেই যেতে হবে, হাটতলায়। নীচু রাস্তাটা লাঠি ধরে আস্তে পার হোল—ওপাশে আবার চড়াই ভেঙে যখন বড় বকুল গাছটার কাছে এল তখন ও রীতিমত হাঁফাচ্ছে—অথচ বাড়ী থেকে এখনো দুশো গজও আসেনি। আর কি পোষায়! ন পারা যায়! সুদাস আর একটি পাও হাঁটতে পারে না—এখন তার হরিনাম করবার বয়স—এ বয়সে এই হাটতলা-রথতলা করা কি যায়? কিন্তু অদৃষ্ট! সুদাস চোখের কোণটা মুছে নিল গামছায়।

নদীকিনার ধরেই বরাবর একটা রাস্তা—বাঁ দিকে বাড়ীঘর—ডানদিকে নদীর ধার। খুব খানিকটা গিয়ে বুড়ো-বটগাছ আর উঁচু দেবদারু গাছ দুটো যেখানে জড়াজড়ি করে ছায়ার আঁচল বিছিয়েছে, সেইখানেই বসে হাট। কিন্তু অনেকটা দূর। সুদাস দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিল। "হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্"—বললো বারকতক। আর কি বলবার আছে ওর? আর কারো নাম তো করবার নাই—কারো কথা ভাববারও নাই? না—আছে। এখনো মিলনের কথা ওর ভাববার আছে। অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে,—সুদাস তাকে একলা রেখে কোথাও যেতে পারে না, এমন কি মরতেও পারে না। অথচ মরতে হবেই—দিন আর বেশি নাই। সেদিন সুদাস কার কাছে রেখে যাবে মিলনকে! মহাপ্রভুকেই বা কার জিম্মেতে দিয়ে যাবে! মিলনের দাদা হয়তো এসে তাকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু বড় কষ্ট পাবে মিলন সেখানে। গরীবের ঘর তাদের। মিলনকে হয়তো ধান ভানতে হবে, কাপড় কাচতে হবে; হয়তো বা কোথাও ঝি-গিরি করতে হবে। সুদাসের ছেলের বৌ—সুদাসের আদরের বৌমা—তার হবে এমন পরিণাম! আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সুদাস। না—তার চেয়ে মিলনের একটা বিয়েই দিয়ে দেবে—যাপাচন্দন! ওদের

সমাজে তো চলে সেটা! সুদাস শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাইত নিযুক্ত করে দেবে মিলনকে—তাহলেই ঠাকুরের সাতবিঘে জমি মিলনেরই থাকবে।

কিন্তু—কিন্তু একটা চিন্তা সুদাস কিছুতেই সইতে পারে না—নরোত্তমের বৌ অন্য কারো অঙ্কশায়িনী হবে—নরোত্তমের পৈতৃক ভিটেতে বসে অন্য একজন কোথাকার-কে তারই বৌকে নিয়ে আনন্দ করবে—সুদাস কল্পনা করতেও কষ্ট বোধ করে। সে আবার এসেই তমাল তলার সমাধিটা ভেঙে দেবে—হয়তো নরোত্তমের পাঠ্য বইগুলোকে ওজন দরে বেচে দেবে—হয়তো নরোত্তমেরই গায়ের মটকার পাঞ্জাবী আর রেশমী চাদরখানা পরে ঐ মিলনেরই চিবুক ছুঁয়ে…!

সুদাস আবার জোরে নিশ্বাস ফেলে হাটতে লাগল জোরেই। "গোবিন্দ হে! পার কর—"। কিন্তু পার যে সে হতে চায় না। না—মরতে এখনো চায় না সুদাস। মরণকে সুদাস ভয় করে—ভাবে, আরো বছর কয়েক বেঁচে থাকতে পারলে মিলনের যৌবনটা ভাঁটিয়ে যাবে, —বিয়ের যোগ্যতা তখন আর থাকবে না—থাকবে না চরিত্রহানির কোনো সম্ভাবনা। সুদাস নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারবে।

কিন্তু বেঁচে থাকলেও যে ভিটে ছাড়া হতে হচ্ছে এবার—তার উপায়, কি! কোথায় যাবে সুদাস ঐ প্রমত্ত যৌবনবতী মেয়েকে নিয়ে—কার কাছে আশ্রয় নেবে? সুদাস আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো!

—সুদাস বাবাজি যে—হাটে যাবে?—দেখো, দেখো, সামনে গর্ত্তটা…!

কে যেন সুদাসকে সাবধান করছে—আর সেই সঙ্গে সুদাসের দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার দিকে ইঙ্গিতও করছে। কিন্তু দৃষ্টি খুব ক্ষীণ হয়নি সুদাসের—ভালই দেখতে পায় সে এখনো। লাঠিটায় ভর দিয়ে বাঁ দিকে চেয়ে দেখলো—দুলাল। হরি চক্রবর্ত্তীর ছেলে দুলাল—নরোত্তমেরই বয়সী—খেলতো, বেড়াতো, পড়তো সব একসঙ্গে! সবল সুস্থ দেহখানা তার দেখলো একবার সুদাস—গেঞ্জী গায়ে দাঁড়িয়ে আছে! যেন একটা কচি-

কোড়াওঠা বাঁশ—এমনি ঋজু আর সুস্থ দেহখানা। নরোত্তমও অমনি ছিল, —বরং আরো সবল আর সুন্দর ছিল—আর ছিল তার কালো কোঁকড়া নরম নরম চুল সারা মুখ ছেপে—দুলালের অমন চুল নাই—গলাও অমন মিষ্টি নয়। নরোত্তম বেঁচে থাকতে গাঁয়ের সখের থিয়েটারে সেই ছিল লক্ষ্মণ, না হয় অর্জ্জুন, না হয়তো—মানে খুব ভাল পার্টই পেত নরোত্তম! দুলালরা তখন যেত নরোত্তমের বাড়ী—খেলা করতো, আড্ডা দিত, ইয়ারকি করতো—সুদাস আড়াল থেকে দেখে হাসতো। এখনো দুলালরা যেতে চায় কিন্তু সুদাস চায় না। এখন এই দুলালদের যেতে-চাওয়ার অর্থটা বোঝে সুদাস—সেটি আর কিছু নয়—মিলনের রূপের আগুনের আকর্ষণ। আরো বোঝে—এই যে খাতির করে ডাক্—'সুদাস বাবাজি'—এই যে সাবধান করে দেওয়া 'গর্ত্ত আছে'—এই যে ভাব জমাবার চেষ্টা, এর অর্থটাও ঐ—সুদাসের বাড়ীতে আছে যে অমূল্য সম্পদ—তারই দিকে নজর! কিন্তু করবে কি সুদাস! ক'দিন এমন করে আগলে আগলে বেড়াবে মিলনকে! অসম্ভব! তবে মিলন খুব ভাল মেয়ে—খুবই ভাল মেয়ে মিলন। আর কেউ হলে কি এতদিন চুপ করে থাকতো! করেই বসতো একটা কেলেঙ্কারী!

—চল বাবাজি, আমিও যাব হাটে···দুলাল এগিয়ে এল। হাতে একটা চটের থলি—বাজার করবার ভদ্র কায়দা! সুদাস দেখলো চেয়ে, কিছু বলল না। দুলাল সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল—খানি[illegible] এসে বলল—কষ্ট হচ্ছে বাবাজি?

—না, কষ্ট হলে চলে কৈ!—সুদাস গম্ভীর হয়ে হাঁটছে, আর ভাবছে দুলালের এই আত্মীয়তা জানানোর মধ্যে কোন গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে লুকানো। ভেবে হাসি পাচ্ছে সুদাসের। এই সব ছেলেছোকরারা বোঝে না যে ওদের বয়সটার অভিজ্ঞতা বুড়োদের আছে কিন্তু বুড়োদের বয়সের অভিজ্ঞতা ওদের নেই। ঐ বয়সে যে কোন্ উদ্দেশ্যে কোন কাজ

মানুষ করে, সুদাসের সেটা ভালই জানা আছে। হাসলো সুদাস ক্ষীণ হাসি। কিন্তু দুলালের লক্ষ্য নাই সেদিকে—পাশে পাশে যেতে যেতে ও বলল আবার—নরু তোমাকে মেরে গেল বাবাজি—আহা, আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল। নরুর পর থেকে গাঁয়ের থিয়েটার আর তেমন করে জমলো না। কালই কথা হচ্ছিল—এবার পূজোয় 'গ্রামলক্ষী' পালা হবে কি না—তাই কথা হচ্ছিল, নরু নাই—নায়ক সাজবে কে! নরু আমাদের ব্যাচ্‌টাকে ভেঙে দিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ভেঙে দিয়ে গেছে—ভেঙেছে না কচু! থিয়েটার ওদের দিব্যি চলছে। নরু গেছে, কি তাতে ওদের এসে-যায়! কোনো বছর থিয়েটার বন্ধ হয়নি—একটা দিনের জন্যও না। যেমন চলছিল, তেমনি চলছে—যে-গেছে—সে-ই গেছে। গেছে সুদাসের আর মিলনের সর্বস্ব। আর কার কি গেছে! হুঁ—যত সব মিছে কথা! কিন্তু সুদাস মুখে কিছু বলল না। দুলাল আবার আত্মীয়তা জানালো—সোমত্ত বৌটাকে নিয়ে তুমি যে কি করবে দাসজি—তাই ভাবি!

এই কথাই কথা—এইটাই ওদের ভাবনার বিষয়—সুদাস ভালই জানে, নরুর জন্য ওরা ভাবে না—ভাবে মিলনের জন্য। সোমত্ত বৌটাকে নিয়ে সুদাস কি করবে—কার জিম্মায় রেখে যাবে—সেইটাই ওরা চিন্তা করে! বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়—শীস্‌ দেয়, অশ্লীল গান গায়—এমন কি নরুর মৃত্যু-দিনের উৎসব করবার জন্য গেলবছর ওরা ঐ সমাধিতে ফুল ছড়িয়ে এসেছে। প্রথমটা সুদাস ওদের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু অল্প পরেই বুঝতে পেরেছিল—ওরা মিলনকে দেখতে এসেছে—মিলনের সান্নিধ্য লাভের কৌশল ওটা—নরুর উপর ভালবাসা ওদের এতোটুকু নাই। আড়চোখে ওরা মিলনের দিকে চাইছিল—আর ইংরেজিতে আলাপ করছিল। সে ভাষা না বুঝলেও সুদাসের অভিজ্ঞ চোখ-কাণ তার আশয়টি বুঝেছিল সেদিন! সুদাসের পিতৃ-

অন্তর তার মৃত পুত্রের এই অবমাননা সইতে পারছিল না, মিলনকে তাই সুদাস ঘরের মধ্যে যেতে বলে দিয়েছিল বেশ ধমকের সুরেই! ওরা হয়তো এ বছরও যাবে—যেতে চাইবে অন্ততঃ, কিন্তু এবার সুদাস ঢুকতে দেবে না ওদের।

—ওর বাপের বাড়ীতে কে আছে দাসজি? দাদা না কে আছে যে?

—হুঁ—সুদাস গম্ভীর হয়ে বলল।

—আসে না বোনের খবর নিতে?

—কি জন্যে আসবে! আমার বৌমা, আমার কাছে আছে, তার এখানে কি দরকার আসবার?

সুদাস তাক্ত কণ্ঠে বললো—বেশ ঝাঁঝালো শোনালো ওর গলাটা।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে তুমি তো আর চিরকাল থাকছো না! দুলাল গ্রাহ্য না করে ফের বললে।

—সে তখন দেখা যাবে!—বলে সুদাস বেশ জোরেই হেঁটে খানিকটা এগিয়ে গেল।

দুলাল বুঝলে, বুড়ো চটেছে। কাজেই ও-প্রসঙ্গ একেবারে ত্যাগ করে অন্য কথা পাড়ল।

—যুদ্ধের যা অবস্থা দাসজি! কি যে হবে ভেবে পাই না। এদিকে তো মন্বন্তর চলছে।

—হুঁ—

—কলকাতায় বোমা পড়েছে, জানো?

—না—পড়ুক গে। কলকাতায় আমার কোনো চোদ্দ পুরুষ থাকে না।

সুদাস গম্ভীরতর হয়ে কথা বন্ধ করতে চাইছে। দুলাল ক্ষুণ্ণ হল। কোনো কথা দিয়েই জমাতে পারছে না ও! আরো খানিকটা হেঁটে বলল—কি কি কিনবে হাটে? সুদাস কোনো

জবাব দিল না। হাটের কাছেই এসে পড়েছে এবার। সুদাস এক জায়গায় ভিড়ের ভেতর ঢুকে দুলালকে এড়িয়ে গেল—হাঁফাচ্ছে। বড্ড জোরে হেঁটেছে সুদাস।

কৃষ্ণ ভট্টাচার্জি বলল—আরে, দাসজি যে—পারলে এতোটা আসতে?

—হুঁ—না এলে উপায় কি আর ভাই—সুদাসের মন একটু খুশী হোল কৃষ্ণকে পেয়ে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক—বেশ অমায়িক—তবে গরীব। তবু গায়ে তার প্রতিপত্তি-আছে।

—এসো—যা দর ভাই উঠেছে আজকাল! যুদ্ধ চলছে আমাদের ভাতের হাঁড়িতে।—কৃষ্ণ ভট্চাজ্ সুদাসের হাত ধরে টানলে। দুজনে কিছুটা আলাপ হোল। কয়েকটা কিছু কিনলো সুদাস, তারপর শুধুলে—

—গৌর কেমন আছে ভাই?

—ভাল! ঝুলনে আসবে হয়তো!

—বিয়ের কি করলে! কিছু ঠিক হোল?

—হ্যা। ঠিক তো আমি কতবারই করলাম। ছেলেই রাজি হচ্ছে না। বলে—'আরেকটু মাইনে বাড়ুক বাবা—দেখি'। আজকালকার ছেলে—বেশি তো কিছু বলা যায় না! সুদাস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—হুঁ, বিয়েটা ভাই একটু বয়সে হওয়াই ভালো। আমি বড্ড ঠকে গেছি। বৌটাকে নিয়ে কি যে করি!

—করবে কি আর! মালাচন্দন করিয়ে দাও কারো সঙ্গে। আমাদের দিন তো ভাই ফুরিয়ে এল—আর ক'দিন। দুঃখের কথা খুবই—যোয়ান ছেলে চলে গেল—কিন্তু কি আর করবে!

—হুঁ, দেখি—আচ্ছা, যাই এবার। বৌমা একা আছে—সুদাস ঘরমুখো হোল।

—তামাক খেয়ে যাবে না দাসজি?

—থাক—দেরি হয়ে গেল ভাই ভট্চাজ! থাক আর আজ!

মনটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে সুদাসের। কৃষ্ণ ভট্‌চাজের ছেলে গৌরাঙ্গ ছিল নরোত্তমের খেলার সাথী। সে এখন ভালো চাকরী করে কলকাতায়। আর সুদাসের ছেলে? ওঃ! নারায়ণ—নারায়ণ! গোবিন্দ হে! পার কর!

সুদাসের বাড়ীর তমাল গাছটার গোল মাথা দেখা যাচ্ছে—তার ওপাশে সেই ঢিবিটায় শরঝোঁপ, কাশবন। কে যেন গাইতে গাইতে আসছে ঐ পথে। ওপাশের নদী পার হয়েই আসছে—কে? বেশ তো গলাটা! সুদাসের চির-অভ্যস্ত কাণ খাড়া হয়ে উঠলো। গান আসছে :—

'না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ—না ভাসায়ো জলে,
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে,
আমি তমাল বড়ো ভালোবাসি···সখি রে··· !'

চমৎকার গলা। কে লোকটি! সুদাস রাস্তার ওপাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল দেখবার জন্য। যে গাইছিল তার মাথার চুড়াটা প্রথম দেখা গেল কাশবনের ফাঁকে—তার পর সারা দেহ। গেরুয়া আলখেল্লায় ঢাকা। হাতে ভিক্ষার চুপ্‌ড়ি একটা, বেশ কারুকার্য্য করা চুপড়িটি। ডান হাতে একটা লাঠি—বেঁকে কুণ্ডলি পাকিয়ে সাপের মত হয়ে আছে। দূর থেকে দেখলে সাপই মনে হয়। কোন্ এক বন্য লতার তৈরী লাঠি। গলায় ওর তুলসী মালা! নতুন কোনো বৈষ্ণব নাকি? কোনো মহাজন হয়ত! সুদাস বয়স-বিদগ্ধ দৃষ্টিটা শানিয়ে দেখতে চাইল। এখনো লোকটা দূরে, দেখতে পেলেও চিনতে পারছে না।

লোকটা এই দিকেই আসছে। আরো কাছে এল। সুদাসের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে! কে তাহলে? সুদাস গলায় জোর দিয়ে ডাকলো, —কে, কোথা বাড়ী? ইতিমধ্যে সুদাস গাড়ীচলা রাস্তায় নামতে আরম্ভ করেছে। ঠিক উত্‌রাইয়ের মত জায়গাটা। পা পিছ্‌লে গেলে পড়ে যাবে—খুব সাবধানেই নামছে। লোকটা সুদাসের ডাকে এদিকে তাকিয়ে

তাড়াতাড়ি কাছে এল। সুদাস ততক্ষণ গাড়ীচলা রাস্তার কাদার মধ্যে নেমেছে। লোকটা সেইখানেই পা ছুঁয়ে ওকে প্রণাম করে বলল,
—ভালো আছো মামা?

—কে? মাধব নাকি?

—হ্যা মামা, আমি মাধব। বাড়ীর সব ভাল। নরু কেমন আছে? আছে তো বাড়ীতে?

—আছে। চল দেখবে, চল—সুদাসের চোখ বেয়ে জল নেমে গেল অকস্মাৎ। মাধব কিছু বুঝতে পারছে না। বোকার মত বলল,
—কি হোল মামা, হোল কি তোমার?

—নরু আছে ঐ তমাল গাছের তলায়, সমাধিতে। চল্ দেখবি।

—অঁ্যা—মাধবও চমকে উঠলো যেন! কিন্তু আত্মসংবরণ করে হাত ধরে সুদাসকে এগিয়ে নিয়ে এল বাড়ীতে। মিলন তখনো ঠাকুর ঘরেই বসে আছে। সুদাস ঢুকতে ঢুকতে বলল,

—বৌমা—ওঠো, মাধবকে হাত-পা ধোবার জল দাও।

মিলন ঘোমটার ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলো মাধবকে। বয়স ধরা যায় না, ত্রিশও হতে পারে, তেত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু রঙটা খুব ফর্সা—আর চোখদুটো লম্বা, টানা, নরুর চেয়ে আরো কালো।

* * * *

বেলা অনেকটা হয়েছে—কাজেই হাত-মুখ না ধুয়ে মাধব একেবারে স্নান করতে গেল কুয়োতলায়। বালতিটা নিয়ে বার বার জল তুলে সর্বাঙ্গ ভালকরে প্রক্ষালিত করছে, সেই জলের ছিটে এসে লাগছে রান্না-ঘরের দাওয়ায়—যেখানে মিলন কি একটা বাটনা বাটছিল। মাথায় ঘোমটা—নাক অবধি টেনে দিয়েছে—কিন্তু পাতলা শাড়ীর ভেতর দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল মাধবের স্নান করা। সুগৌর সবল ঋজু দেহ—সর্বাঙ্গে একটা ভদ্র লাবণ্য। পায়ের, উরুদেশের কালো কালো লোমগুলো

রগড়ে মাধব পথের ধুলো পরিষ্কার করছে। কটিদেশ অবধি অর্দ্ধনগ্ন—মিলন অনেকবার তাকালো! এমন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষদেহ মিলন অনেকবার দেখেছে, তাদেরই ক্ষেতের মুনিষ ঝগড়ু-সাঁওতালটাকে দেখেছে। কিন্তু সে কুচকুচে কালো, নোংরা আর অসভ্য। তাকে দেখে মিলন কোনোদিন দ্বিতীয়বার দেখতে চায় নি—দেখবার কোনো কামনা কখনো জাগেনি—তাকে মিলন বেশ নির্লিপ্তভাবেই এতদিন দেখে এসেছে—ভেবেছে, সাঁওতালরা এমনিই হয়। কিন্তু এই মাধবের কিছুক্ষণ পূর্ব্বের লম্বা আলখেল্লা ঢাকা দীর্ঘ দেহের রহস্যময়তা আর এখনকার এই নগ্ন সৌন্দর্য্যের শিল্পবোধ মিলনকে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে—পুরুষদেহও দ্রষ্টব্য হতে পারে।

ছড়্‌ছড়্‌ করে বালতি থেকে জল ঢাললো মাধব মাথায়। শান-বাঁধানো কুয়োতলায় পড়ে ছিটকে এসে সেই জলের ছিটে লাগল মিলনের শীলে, শাড়ীতে, আর একটা ফোঁটা এসে লাগল ঠিক ঠোঁটের কোনাটায়।

—আঃ!—অব্যক্ত শব্দ করে উঠলো মিলন অকস্মাৎ!

—এঃ, ছিটে যাচ্ছে নাকি বৌদি—খেয়াল করি নাই তো! —বলে শশব্যস্তে মাধব উঠে দাঁড়িয়ে কুয়োর ওপাশে সরে গেল। পিছন থেকে দেখলো মিলন, কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত ক্রমসরু হয়ে আবার কোমরের নীচ থেকে চওড়া হয়ে হয়ে সুপুষ্ট জানুদেশে তরঙ্গ তুলছে। চলবার সময় পিঠের দিকে দুটো গর্ত্ত মত হয়—জলে-ভেজা পিঠখানা রোদ লেগে ঝিকমিক করছে! বেশ লাগলো মিলনের!

কিন্তু বাটনা বাটা হয়ে গেছে। ঝোলটা রান্না হয়ে গেলেই খেতে দেবে। মিলন উঠে পড়ল শীল ছেড়ে। ঠোঁটের কোনায় সেই জল-বিন্দুটুকু ঠিক শিশির-কণার মতই তখনো ফুটে আছে। গামলার স্থির জলের আয়নায় নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল মিলন!

মাধব বেশ করে স্নান সেরে গামছায় গা' মুছতে মুছতে ঘরের বারান্দায় এল! ওর ঝোলাতে আছে একখানা গেরুয়া কাপড়, তাই বার করে

পরতে গিয়ে দেখলো, ওদিকের একটা বেদীমত যায়গায় একজোড়া খড়ম আর দু'তিন জোড়া জুতো রয়েছে। চট্ করে খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে মাধব আবার কুয়োতলায় এসে পা ধুলো—তারপর খড়ম দুটো পায়ে লাগিয়ে চটাং চটাং শব্দ করে উঠে এল বারান্দায়। মিলন দেখল—খড়ম দুটো ওর স্বামীর—সেই নরোত্তমের এবং ঐ জুতোগুলোও। ও-খড়ম পরতে মাধবকে মানা করা উচিৎ মিলনের—কিন্তু মিলন কি করে বারণ করতে পারে। মরুক্ গে! কি আর হবে ও খড়ম দিয়ে! কেউ পরলে তবু কাজে লাগবে।—মিলন ঝোলে ঘি'র ছ্যাকা দিচ্ছে!

সুদাসও দেখলো মন্দির থেকে বেরুতে বেরুতে। পুজো সেরে ও তখন আসছিল এদিকে; দেখলো—নরুর খড়মজোড়া নিয়ে মাধব পায়ে লাগিয়ে দিব্যি উঠে আসছে। নরুর খড়ম—সুদাসের রাগ হয়ে গেল ভয়ঙ্কর—মাধবকে কয়েকটা কড়া কথা বলতে গিয়ে কিন্তু সুদাস সামলে গেল। ওর বয়সের গাম্ভীর্য আর বৈষ্ণবোচিত অক্রোধের জ্ঞান ওকে থামিয়ে দিল! ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সুদাস। মাধব ইতিমধ্যে এই মন্দিরের দাওয়ায় উঠে সুদাসের কাছ ঘেঁসেই গিয়ে ঢুকলো মন্দিরে। আসনে বসে ধ্যান আরম্ভ করে দিল। সুদাস ভাবছে বাইরে দাঁড়িয়ে—খড়ম দুটো নিল মাধব; সবই নেবে, নরুর কাপড়-জামা-জুতো, নেবে সবই। কতকাল আর আগলে রাখতে পারবে সুদাস! কিন্তু, —কিন্তু সুদাস বেঁচে থাকতেই কি নেবে ওরা? নাঃ, সুদাস তা হতে দেবে না। ওর পিতৃহৃদয় যেন কশাহত হচ্ছে আজ! সুদাস নিঃশব্দে খড়ম-জোড়া তুলে নিয়ে এ-ঘরে চলে এল। জুতো দুজোড়া আর চটি জোড়াটিও নিল—তারপর ঘরে ঢুকে নরুর প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটা খুলে তার জমানো জামা-কাপড়ের তলায় রেখে দিল সবগুলো। তালা দিয়ে দিল বাক্সটায়। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়—দেখলো, মিলন নিশ্চল দাঁড়িয়ে দেখছে সবটা! সুদাসের চোখাচোখি হোল মিলনের সঙ্গে। বয়সে বুড়ো

হলে কি হবে, সুদাসের চোখে যৌবনের বহ্নি যেন জ্বলছে। মিলন কুণ্ঠায় মাথা নোয়ালো। সুদাস ডাক দিল,—বৌমা, আমি যতদিন বেঁচে আছি, এ বাক্সের তালা খুলো না—বুঝলে!

—হুঁ—মিলন সংক্ষেপে উত্তর সারলো। খড়মের শব্দ করে সুদাস গিয়ে দাঁড়ালো সেই তমালগাছটার ছায়ায়। ঝিঙে, কাঁকুড়, উচ্ছের কয়েকটা লতা, গোটাকয়েক রামঝিঙে বড় বড় পাতার আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে আছে সমাধিটি—ওরই ঘন ছায়ার তলে ঘুমুচ্ছে সুদাসের কোলের গোপাল! —ঘুমুক—আহা, ঘুমুক! ওর ঘুম যেন পার্থিব কোনো অশান্তিতেই না ভাঙে। ও জানুক—ওর বাবা এখনো ওর সবকিছুকেই ওরই জন্য আগলে আছে।

নরুর মা'র কথা মনে পড়ল সুদাসের—ঐ খানিকটা দূরে নদীর কোল ঘেঁসে রয়েছে তার শেষ শয়ন। পলি পড়ে গেছে যায়গাটায়। নরুকেও ঐখানেই দিতে বলেছিল সবাই; কিন্তু সুদাস রাজি হয় নি। মনে পড়ল, —নরুর মা'কে যখন সুদাস আনে এই ঘরে, তখনকার বিরাট কোলাহলময় ওর সংসার। নতুন বৌ এসে থৈ পায় নি সংসারে। কতো লোক! কতো উৎসব—কীর্তন, ভজন—মহাজন ভোজন। আর আজ!—নরুর ঐ ব্যবহৃত জিনিষক'টা আগলাবার লোক নেই। কোথাকার কে একটা মাধব-দাস এসে নরুর পায়ের খড়ম পরে বেড়াবে! নরুর গায়ের জামা গায়ে দেবে—নরুর বৌএর হাতের রান্না খাবে—নরুর বিছানায় শুয়ে নরুর বৌকে নিয়ে——না! সুদাস কাঁদবে না। কান্না ভুলে যেতে হবে সুদাসকে! মাধবকে সে জানিয়ে দেবে—নরুর কোনোকিছু যেন কেউ ব্যবহার না করে। জানিয়ে দেবে মিলনকেও!

—খড়ম দুটো!—মাধব মন্দিরের বাইরে এসে বিস্মিত হয়ে বললো। সুদাস ঘাড় না ফিরিয়েই জবাব দিল—ও খড়ম নরুর। নরুর কোনো-কিছু কেউ নিওনা বাবা তোমরা!

—ওঃ, আমি জানতুম না মামা—কুণ্ঠিত মাধব জবাব দিয়ে খালি পায়েই এসে দাঁড়ালো সমাধির কাছে! পরম আত্মীয়তার সুরে বলল,

—জানলে আমিই নিতাম না মামা··· ।

—হুঁ—বলে সুদাস ফিরলো!

মাধব নরুর সমাধিতে কল্যাণকামনা জানিয়ে ওর পিছনেই ফিরে এল ঘরের রোয়াকে! দুখানা আসন বিছিয়ে জল গড়িয়ে মিলন খাবার যায়গা করে রেখেছে। সুদাস নীরস কণ্ঠে বললো—বসো মাধব!

—হ্যাঁ—মাধব বসল সুদাসের পাশের আসনে। সুদাস খায় আতপ চালের ভাত, মিলনও তাই খায়—কিন্তু আজ মিলন একমুঠো সেদ্ধচাল কুটিয়ে নিয়েছে মাধবের জন্য। সুদাস চেয়ে দেখলো—বড় থালাটায় মিলন মাধবকে দিল সরু চালের ভাত। সুন্দর করে সাজিয়েছে,—থালের কিনারায় কলমীশাক ভাজা—ঢেঁড়স ভাজা আর পাতলা করে কাটা কচুভাজা। ভাতের চূড়াটি ঠিক মন্দিরের মত—তার উপর একটু ঘি—পাশে পাতি লেবু। সুদাসের থালাও ভালই সাজিয়েছে মিলন—কিন্তু মাধবের থালাটাই সুদাসের চোখে বেশি সুন্দর মনে হোল! সুদাস তবু কিছু বলল না—বলল মাধব—আমার জন্য আবার আলাদা কেন! আতপই খেতাম।

—তা হোক—তা হোক—তোমার অভ্যেস নেই—সুদাস তাড়াতাড়ি বলল। বড়মের-জন্য-বল রুঢ় কথাটা সুদাসের মনকে পীড়িত করছিল যেন—কিছুটা স্বস্তি পেল এতক্ষণে। মাধব সুদাসের এমন কিছু আত্মীয় নয়—দূর সম্পর্কীয় এক বোনের ছেলে—তাই মামা বলে। বহুদিন ও দেশে ছিল না—কোথায় গিয়েছিল, এতক্ষণে প্রশ্ন করল সুদাস। বলল,—তুমি এতকাল কোথায় ছিলে বাবা মাধব? বিয়ে-থাওয়াও করলে না, ঘরসংসারও দেখলে না—করবে কি তুমি?

—বৃন্দাবন, মথুরা, গয়া, কাশী—এইসব ঘুরলাম মামা—তারপর দক্ষিণে নীলাচল, ভুবনেশ্বর হয়ে মাদুরা—ত্রিচিনপল্লী, রামেশ্বর পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম—সুযোগ পেয়েছিলাম।

—বলো কি! সব তীর্থই দেখা হয়ে গেল?

—না—সব কি আর দেখতে পারি! তবে অনেক তীর্থই দেখলাম এই আট দশ বছর ধরে।

—ও: তা নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিশ্চয়ই দেখেছো?

—হ্যা—আহা! সে যে কী অপরূপ দর্শন মামা! দাঁড়িয়েই রয়ে গেলাম আমি!

—হুঁ—শুনেছি, খুবই নাকি সুন্দর। আমার আর যাওয়া হোল না এ-জন্মে!

—কেন মামা! কী এমন বেশি কথা? বলো তো এই রথের সময়ই তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি।

—না বাবা! আর অতদূর যাওয়ার সামর্থ্য নাই।

—কিছু ভাবনা নাই মামা। রেলগাড়ীতে একটু ভিড়—তো হোক—সাধটা মিটিয়ে নাও তুমি।

—দেখি তেবে। হাতে টাকাকড়িই বা কৈ! দিন তো কোনো-রকমে চলছে—আকালের বাজার!

—হুঁ—সে তো বটেই—মাধব ভাতের গ্রাস মুখে তুললো! গ্রাসটা গিলে বললো—বেশি কিছু খরচ নয়—চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হলেই তোমাদের দুজনের হয়ে যায়।

—কোথায় পাই বাবা! বলো? সুদাম ধরা গলায় বলল—যে দেবার মালিক সে তো ঐ ঘুমুচ্ছে ওখেনে!

মিলন ও-ধরে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কটা কথা শুনেই ও বুঝতে পারলো—মাধব ছন্নছাড়া গৃহত্যাগী বৈরাগী—অবিবাহিত! মাধবকে

ও হয়তো বিয়ের সময় দেখেছে, কিন্তু মনে ছিল না। তেমন কোনো বিশেষ আত্মীয় হলে নিশ্চয় মনে থাকতো। এ-বাড়ীতে মাধবের কথা কোনোদিন শুনেছে বলেও মনে পড়ে না মিলনের—কার কাছেই বা শুনবে! কিন্তু ঐ মাধব লোকটি তো বেশ। দেশবিদেশ কত ঘুরেছে—বইএ পড়া সেইসব দেশ, বৃন্দাবন, মথুরা—নীলাচল—নীলগিরি—কত কি দেখে এসেছে ও। ওর কাছে সেই সব দেশের কথা শুনতে পারলে বেশ হোত! কিন্তু ও যে ভাস্থর! দেওর হোল না কেন! হলে কিন্তু বেশ হোত!

ঝোল নিয়ে এগিয়ে এল মিলন। নিরামিষ ঝোল। মাছ-মাংস-ডিম খায় না সুদাস, তবে মিলন মাছ খায়। খেতে বাধ্য করেছে ঐ সুদাসই। সুদাস কোনোদিন মিলনকে বিধবার মত থাকতে দেয় না—এমন কি, লাল পাড় শাড়ী পর্যন্ত পরায়। মাছ খায় মিলন—মাধব খায় কি না কে জানে? খেতে দিতে পারে কিন্তু মিলন। ওর চুনোপুঁটি মাছের টক রান্না করা আছে আর হেঁসেলে। শুধুবে নাকি! মিলন ইতস্তত করছে। সুদাসই বলল,—খেতে খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা তোমার—মাছ খাও তো?

—হ্যা—খাই, কষ্ট কিছু হচ্ছে না। রান্না তো বৌমার খুবই ভালো! অমৃত যেন!

ঝোল দিয়ে মিলন পিছন ফিরে আসছে রান্নাঘরের দিকে! ওর মেদবিহীন শ্রোণীযুগলের তরঙ্গায়িত ভঙ্গীটার দিকে কেউ যেন তাকাচ্ছে মনে হোল। কেউ তাকালে মানুষের মন যেন জানতে পারে। মানুষের মনের এ একটা অদ্ভুত শক্তি! মিলন লজ্জারক্ত হয়-হয় হচ্ছে।

সুদাস বলল—কাপড়টা সামলে নাও বৌমা!

পিঠের আঁচলটা সরে গিয়েছিল—মিলন বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে কোমরের নীচে টেনে দিল—ঢুকলো গিয়ে রান্নাঘরে। ওর পরনের শাড়ীটা গভীর নীল রংএর—পাড়টি ময়ূরকণ্ঠী। ওর ফর্সা গায়ে

চমৎকার মানাচ্ছে। কিন্তু এ শাড়ী তো আজ পরবার কথা ছিল না। কেন যে পরেছে, মিলন নিজেই বুঝতে পারছে না। কিন্তু পরেছে। শ্বশুরের কথায় ওর মনটা লজ্জারুন হয়ে গেল একটু ক্ষণের জন্য। বড্ড পাতলা শাড়ীখানা—তলায় সেমিজ আছে, তবু এ শাড়ীটা বর্ত্তমান সময়ে ওর পক্ষে অনুপযুক্ত!

তাকিয়ে ছিল মাধবও; তারই দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদাস কথাটা বলেছে। মাধব বহুদেশ-ঘোরা অভিজ্ঞ মানুষ—মনের ভেতর হাসল একটু! এতক্ষণ পর্যান্ত নিজের কথাই ভাবছিল সে—এবার যেন চিন্তাটা এই সংসারের ক্ষেত্রে নেমে এল। বলল—ছেলেমানুষ! কতটুকু ওর বয়েস! আহা!

—ছেলেমানুষ হলে তো চলবে না বাবা। এই সংসার ওকেই চালাতে হবে। ধীর-স্থির না হলে চলবে কেন? এই দরদোর, পুজোপার্ব্বন, আগত-স্বাগত···!

মাধব আর কোনো কথা বলল না। মিলন অত্যন্ত সাবধানে কি একটা আনছে।

এসে পৌছালো—পা টিপে টিপে এল—গুঁড়ি হয়ে রেখে দিল মাধবের থালার এক পাশে। জিনিষটা কালকার বাসি চুনোপুঁটিমাছের টক। সরষের তেল মেখে দিয়েছে। মাধব দেখলো! দেখলো ওর কোমল, ছোট পা দুখানা—বুড়ো আঙ্গুলের চিকচিকে নখটি, প্রান্তের আলতা পরবার মসৃন রেখাটি। আলতা নাই, থাকলেই যেন ভালো হোত। এমন টুকটুকে রাঙা পায়ে আলতা ছাড়া আর কিছু মানায় না—চমৎকার দেখতে হোতো। কত কাজের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়, তবু পা দুটি কেমন সুন্দর আছে! জুতোও পরে না—খড়মও পায়ে দেয় না—তবু কত সুন্দর!

—খাও বাবা—মাধব!—সুদাস বলল। মাধবের সম্বিত ফিরে এল যেন। তাড়াতাড়ি ঐ টকের মাছ দিয়েই একগ্রাস ভাত মুখে পুরে

দিল। রাস্তাহাঁটা ক্লান্ত শরীর—তার উপর রাত জেগে এসেছে। বাসি টক্ চমৎকার লাগছে ওর মুখে। সবটাই খেয়ে বলল,—বাঃ, টক্‌টা ভারি সুন্দর হয়েছে। দিতে পার আর একটুন বৌমা!

মিলন এর মধ্যে ফিরে গেছে রান্নাঘরে। নিজের ভাগের মাছটুকু এনে আস্তে ও ঢেলেদিল মাধবের পাতে! সুদাস খবর রাখে না, কতটা মাছ আছে, তবু বলল—তোমার ভাগটাই দিয়ে দিলে না তো মা—আছে তো তোমার জন্যে?.

শ্বশুরের দিকে একবার তাকিয়ে কি যে বললে মিলন, কে জানে! মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয় ও। কিন্তু সুদাস বুঝলে—মিলনের মাছ আছে। মিলন ধীরে ধীরে আবার ফিরে গেল রান্নাঘরে।

মাধব বলল—কতকাল যে এমন করে খেতে পাইনি!

—বিয়ে-থা কর বাবা—সংসারী হ'। তোদের কি তীর্থ করবার বয়স! বলল সুদাসই।

• রান্নাঘরের ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে মিলনের একটা চোখ দেখা যাচ্ছে। বাকি মুখখানা আড়ালে। ও দেখছে এদের, শুনছে সব কথাই। ওর রান্নার প্রশংসা কদাচিত পেয়েছে ও। প্রশংসা করবার লোক কৈ! আজ পাঁচ বছর ধরে ওর ঘরে বিশেষ কোনো অতিথি আসে নি। কাউকে বসিয়ে খাওয়াবার কথা মনেই পড়ে না মিলনের। মাঝে-সাঝে ওর দাদা আসে—একবেলা থাকে, নিজেই উদ্যোগ-আয়োজন করে নিয়ে-থুয়ে খায়—চলে যায়। তার মধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য, কোনো নিবিড় আনন্দ-রস খুঁজে পায়নি মিলন। আজকার দিনটা যেন আলাদা মনে হচ্ছে!

মাধব মুখ তুলতেই জানালার ভাগর চোখটার দৃষ্টিরেখা লাগল মাধবের চোখে—কালোর আলো যেন! যেন উড়ন্ত ভ্রমর একটা! হাতমুখ ধুয়ে ওরা বারান্দাতেই বসল। সুদাস তামাক খায়। মিলন কলকেতে ফু দিতে দিতে আসছে। ঘোমটার ভেতর থেকে মুখটা বেরিয়ে আসছে—

ঠোঁট দুটোয় আকুঞ্চন দেখা যায়। সুদাস তাড়াতাড়ি হাত থেকে কলকেটা নিয়ে বলল—খাও, খাও গে!

—পান নেই?—শুধুলো মাধব। পান থাকে না। সুদাস খায় না পান, হর্তুকি খায়—মিলনও কদাচিত খায় পান। অবশেষে হর্তুকিই নিল মাধব। ও একটু ঘুমুতে চায়—রাত জেগে এসেছে। বলল—

—আমার একটু গড়াতে হবে কোথাও!

—হ্যাঁ, এসো বৈঠকখানা ঘরে—সুদাস এগিয়ে এল। বিছানা ঠিক করা আছে চৌকিতে।

—শোও তুমি—বলে সুদাস কয়েক টান তামাক টেনে নিল। তারপর আর একবার বলল—শোও—বলে এদিকে এল হুঁকো হাতে। মিলন এঁটো কুড়ুচ্ছে। সুদাস বলল—আগে খেয়ে নিলেই তো পারতে মা! বেলা হল অনেকটা!

—কাকে ছড়িয়ে ঘরময় করে দেবে বাবা—বলে মিলন নিজের কাজ করে চলল। সুদাস আস্তে ঢুকে গেল ওর শোবার ঘরটায়। মিলন গেল থালাগুলো নিয়ে কুয়োতলায় নামাতে! কয়েকটা গাঁদাগাছ আপনি গজিয়েছে ওখানে। ফুলের কুঁড়ি এসেছে। মিলন বাঁ হাত দিয়ে পট করে একটা ছিঁড়ে নিল—খামোখা, অহেতুক!

হাতটা ধুয়ে রান্নাঘরে এসে ভাত বাড়লো নিজের জন্ত। খেতে খেতে কত কি ভাবছে ও। ভাবছে—মাধব ওকে দেখছিল। দেখবার মত কোন অঙ্গই ও অনাবৃত রাখে নি—তবু দেখছিল মাধব। ওর চলনভঙ্গী, ওর [illegible] হাত—পায়ের পাতাটা, হয়তো বা ঠোঁটের কিনারা—[illegible] বিন্দুটা লেগেছিল—মিলন আনমনে জিভ দিয়ে চাটলো সেই [illegible]। সে-জলবিন্দু [illegible] শুকিয়ে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লেগে আছে এখনো!

আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করে মিলন কুয়োতলায় এসে বাসন মাজতে [illegible]—বেলা তিন প্রহর।

সোবামাত্রই ঘুমিয়ে যাবে—মাধব মনে মনে ভেবেছিল। ছুটো রাত পুরোপুরি ওর জাগা আছে। আসছে সেই কোন্ দূর দাক্ষিণাত্য থেকে। ট্রেনের স্থবিধা নাই; অনেক ঝঞ্ঝাট পুইয়ে, অনেক ঝামেলা সয়ে ওকে আসতে হয়েছে। না এসে উপায় ছিল না, তাই এসেছে। সেই কথাই ভাবছিল মাধব শুয়ে শুয়ে। হাতের বিড়িটা নিবে গেছে, আবার জ্বালালো। শৈলী শেষটায় এমন দাগা দেবে, ও ভাবতেই পারে নি। মেয়ে-জাত্ টাকেই ভয় করতে আরম্ভ করেছে মাধব এখন। আস্তে আস্তে ওর মনে পড়ছে ওর এই আটদশ বছরের ফেলে-আসা জীবনের কথা।

একটা কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে ও কলকাতায় গিয়েছিল গান করতে। দলটার নামডাক ছিল, তারপর কলকাতায় গিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ম্যানেজার একেবারে 'হয়কে নয়' করে ছাড়লো—লিখলো, "বাংলার অবিসম্বাদী কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়"—লিখলো, "মান, মাথুর, মিলনের অমৃত-মাধুরী মাখা"—আবার লিখলো "রাধাকণ্ঠী রাণীবালা, সুধাকণ্ঠী শৈলরাণী, কিন্নরকণ্ঠী কুসুম, কোকিলকণ্ঠী কুমারী কণিকা"—এতো গেল, আবার লিখলো, "—কৃষ্ণদাসের সুধাম, ব্রজগোপালের শ্রীদাম, মাধব দাসের শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া সেই অতীত বৃন্দাবনের মিলন-মাধুর্য্যের মরকতকুঞ্জে লইয়া যাইবে···" ইত্যাদি!

হু হু করে বেড়ে গেল নাম, হরদম্ টাকা আসতে লাগল। বায়নার পর বায়না—শেষে সহর ছেড়ে দল গেল পশ্চিমে, সেখান থেকে দক্ষিণে—! আধখানা ভারত প্রায় ঘোরা হয়ে গেল ওদের। যেখানে বাঙালী আছে, সেইখানেই আদর পেয়েছে। মাধবের মনে পড়ছে সেই সুখের দিন। দলের মধ্যে বেশি খাতির মাধবেরই ছিল। শুধু ভাল গান করতে পারে বলেই নয়, এমন কিছু কাজ নাই যা সে-না পারে। রান্না করতে পারে—বাটনা

[illegible] [illegible] [illegible] থেকে সব কিছুই পারে। [illegible] [illegible] দিতে পারে—বাজনার খারাপ হলে গাইতে পারে—দরকার হলে [illegible] দিতেও পারে। তাছাড়া পারে চমৎকার কথা বলতে। দলের [illegible] ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্গে কথা কইতে ওকেই নিযুক্ত করতেন। বাকির সব রকমেই ছিল। গোটা তিনচার মেয়ে—সবাই বাজারের—বাগদী, কেওট, আর ডুলে—তিনজাতের তিনজন। শুধু শৈলীর জাত্ কেউ জানতো না। দলের সেরা সুন্দরী, দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে। কুটোটি কেটে দুটো করবে না, সেও কিন্তু মাধবের খাতির করতো। বলতো, 'মাধবদা না হলে দল কানা!' কিন্তু শেষটায় ঐ শৈলীর জন্যই এই অবস্থা। মাধব আজ পথে পথে।...যাক্ গে!

মাধব পাশ ফিরে শুলো—বিড়িটা ফেলে দিল। আবার একটা নতুন কিছু করতে হবে, নইলে পেট চলবে না—কিন্তু তার আগে যে ভয়ঙ্কর ভাবনাটা রয়েছে—মাধব আবার ভাবতে লাগলো। কয়েকটা জবাব ঠিক করতে লাগলো মনের মধ্যে। কিন্তু মনোমত হচ্ছে না। একজন উকিলের পরামর্শ ই নেবে নাকি! দেখা যাক! অরেকটা বিড়ি ধরালো মাধব। উঃ! মেয়ে-জাত্ কে কখনো বিশ্বাস করতে আছে! বাপস্! কেউটের ছোবল ভালো! প্রথম যেদিন দেখা ঐ শৈলীর সঙ্গে,—মনে পড়ল, পালা ছিল 'মান'। শৈলীই রাধা সেজেছিল, আর কৃষ্ণ হয়েছিল মাধব! কলকাতার রূপকার নীল পাউডার মাখিয়ে মাধবকে একেবারে আকাশবরণ করে তুলেছিল। মাথায় চুড়ো পরে, চাচর চুল দুলিয়ে মাধব সেদিন ঐ হারামজাদী ধোপার মেয়েকেই বলেছিল—"দেহি পদ পল্লব-মুদারম্—তোমার পায়ে ধরি রাই!" ধরেছিল পায়ে—ঐ ধোবানীর পায়েও ধরেছিল মাধব—ছিঃ। ধোবানী নাতো কি আর! জাতের কথা কিছুতেই বলতো না—শুধু বলতো—আমাদের আবার জাত কিসের! আমরা গোকুলবাসী গোপীজন! ওরে আমার গোপীজন রে!

[illegible]

...দের লোকেরা শৈলীর সঙ্গে কত কথা বলেছে, কত গান গেয়েছে। আড্ডায় একেবারে ভেঙে পড়ল একেবারে—আর সেইদিন থেকেই শৈলীর সঙ্গে মাধবের ভাব হয়ে গেল! ভাব ও সবার সঙ্গেই, অভাব কারো সঙ্গে নেই। তবু অধিকারীর সঙ্গে ভাব না রাখলে চলে না—তাই রাখতে হয়। কিন্তু মাধবের সঙ্গে সত্যি ও ভাব করলো, বলল—, মাধবদা' বলল—'দাদামণি,' তারপর একদিন কানে কানে বলল—'বৌই আমার!'

অন্তরের অন্তস্থলে অবগাহন করে মাধব কুড়িয়ে নিয়ে এল এই হাসি-হাসটুকু, কিন্তু সঙ্গে উঠে এল আরো অনেক বিষামৃত। দলের লোক ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সয়ে গেল সবাই—মাধব গুণী লোক! এমন কি, অধিকারী পর্যন্ত সয়ে গেল শৈলীর এই পক্ষপাতিত্ব। বাকি তিনটে মেয়েকে নিয়ে যখন দলের লোকগুলো ব্যস্ত তখন মাধব শৈলীকে একটা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসিয়ে রান্না করতো—শৈলী হুকুম করতো, —এটা কর, সেটা কর। মাঝে মাঝে গাইতো:

"না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ না ভাসায়ো জলে..."

রান্না শেষ করে মাধব সবাইকে খাইয়ে বলতো—শৈলী অসাধারণ। ও না থাকলে কে এতো সব করতো বলুন তো!—শৈলীর প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ হয়ে উঠতো সবাই। আর শৈলী মিচকি মিচকি হাসতো, বলতো—বামুনের মেয়ে—কত যজ্ঞি রেঁধেছি। এই কটা লোককে খাওয়ানো কি বেশি কথা!

রাণীবালা, কুসুমমালা, কণিকামণি—এরা সকলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো বোকার মত। বামুনের মেয়ে—শৈলী! ওদের বলবার মত নেই কিছুই। ওদের জাত-জাত সব জানা অধিকারীর। নামগুলোও অধিকারীরই দেওয়া। পূর্বজীবনে ওদের নাম ছিল খেঁদী, নান্নু—আর ভুলু!

অনুপ্রাসের সুবিধার জন্য অধিকারী ঐ সব নাম রেখেছে,—অভিজাত নাম, শোনায়ও ভাল ! তাছাড়া, মেয়েগুলো বাজারের মেয়ে—সেকথা অধিকারী প্রকাশ করে না—বলে—"গৃহস্থ-কন্যা-সমবায়ে সংগঠিত সম্প্রদায়" লোকটা অনুপ্রাসের চূড়ান্ত ভক্ত। ওর নিজের রচিত যে দু' একটা পালা গাওয়া হয় তাতে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। ওর নিজের নামটাও অনুপ্রাসবহুল ; নাম—গোপীপদ পাল—প'কারের গাদা লেগে গেছে। মাধব আবার আরো কয়েকটা জুড়ে দিয়ে একদিন বলেছিল—গোপীজনবল্লভ পদরেণু পাল ! অধিকারীর কাণে কথাটা উঠলে তিনি বলেন—মন্দ নয়—অনুপ্রাসের জ্ঞান আছে মাধবের !

বিড়িটা ফেলে দিয়ে মাধব আবার শুলো ভালো করে।—বামুণের মেয়ে শৈলী। হ্যা, বামুণ না আরো কিছু ! ও ঠিক ধোপানী। কিন্তু, কিন্তু অধিকারী কিছুতেই ওর নাম বদলাতে পারে নি—বললেই বলতো, —আমি বাবু ভজহরীর মেয়ে—নামটাম্ বদলানো চলবে না—আমার মা-বাবার রাখা নাম—শৈলবাসিনী চক্কোত্তি। কপালে যা ছিল হইছে, তা'বলে নাম কিসের লেগে বদলাবো—নাম আমার খারাপ তো কিছু নয়—তোমরাই খারাপ করে ডাক 'শৈলী'—কেন, 'শৈল' বলতে পার না ? যত সব··· !

অধিকারী থেমে গেছে—শেষে অনুপ্রাস ঠিক করে নিয়েছে 'সুধাকণ্ঠী শৈলী'—নাহলে 'রাধাকণ্ঠী' কথাটাই শৈলীর নামের আগায় লাগাতো ও। বোকা শৈলী এমন একটা চমৎকার বিশেষণ পেল না—হাসি পেল মাধবের। শব্দ করে হেসে উঠলো নিজের মনেই।

হাসলো কে অমন করে ? চাপা হাসি ! কেউ কোথাও থেকে দেখছে নাকি মিলনকে ! আকাচাকা চাইল মিলন। বাসনগুলো ধোয়া-মাজা

গোছানো হয়ে গেছে। তুলে ঘরে নিয়ে যাবে—কিন্তু কে হাসলো! কি জন্যে হাসলো? মিলনের কোনো অঙ্গ অনাবৃত হয়ে নাই তো! কোনো অদ্ভুত কাজও করেনি তো মিলন! হাঁ—করেছিল—এই এখনি মিলন চক্‌চকে আয়নার মত বেলি থালাটায় মুখ দেখছিলো—দেখছিল গলার কোমল রেখা তিনটি—ঠোঁটের লালিমাটুকু—তারপর ঠোঁট উল্টে দেখছিলো ছোট ছোট দাঁতগুলি—গোলাপী মাড়ীটা—আর ঠোঁটের ঠিক উপরেই সেই কালো তিলটি। কিন্তু দেখলো তো কি হোল? ঐ দেখে কারো হাসবার কিছু আছে নাকি! আছে হয়তো—হয়তো হাসি পায় ওদের—ঐ ছোঁড়াগুলোর—যারা মিলনের বাড়ীর আনাচে কানাচে নানা অছিলায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কৈ—কেউ তো কোথাও নেই! কে তবে হাসলো! মিলন উঁকি দিয়ে দেখলে—সুদাস ঘুমুচ্ছে ঘরে। তবে কি ঐ নতুন লোকটি হাসছে! মিলন আস্তে পা ফেলে এদিকে এসে বড় করবী গাছটার আড়ালে দাঁড়ালো—অনেকটা তফাৎ—তবু বৈঠকখানার ছোট জানালাটার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—বালিশে মুখ গুঁজে মাধব উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হাসির ধমকে ওর দেহটা কাঁপছে একটু একটু! তাহলে ওই গোপনে উঠে এসে মিলনের মুখ-দেখাটা দেখে ফেলেছে, নিশ্চয়। তাই এত হাসি! এসেই শুয়ে পড়ে হাসতে লেগেছে। কিন্তু কী এমন অন্যায় করেছে মিলন! আচ্ছা তো লোক!

এখানে দাঁড়ালে আবার দেখে ফেলবে মিলনকে। দরকার নেই। হাসুকগে! যার যা খুসী করুক—মিলনের কিছু বয়ে যাবে না। নিজের মুখ দেখবারও অধিকার নাই নাকি কারো? চলে এলো মিলন ওখান থেকে! বাসনগুলো তুলে ঘরে গিয়ে সাজিয়ে রাখলো—শব্দ হচ্ছে টুং টাং; ঝিন্ ঝিন্! সুদাসের ঘুম ভেঙে যাবে—শব্দটা কমিয়ে দিল হাত দিয়ে ছুঁয়ে। তারপর বাইরে এসে দেখলো, কোনো কাজ আর এখন করবার নাই। শুয়ে থাকবে নাকি খানিকটা! বেলা তো অনেক আছে। বর্ষাকালের বেলা

পড়তেই চায় না। কিন্তু ঘুমুলে আবার রাতে ঘুম আসে না—জেগে থাকলে ভয় করে বড্ড! নদীর ধারে ঘর—কত ভূতপ্রেতের কথা মনে হয় মিলনের। থাক্—দিনে না ঘুমুনোই ভালো। বই পড়বে। কি বই পড়বে!—সবই তো পড়া! আর যা বই আছে সে-সব নরুর বই, আছে ঐ যে ছাদের কোণের ঘরটায়। দোতলায় ঐ একটা মাত্র ঘর, নরু পড়তো সেই ঘরে, শুতোও। তার খাট-বিছানা সবই রয়েছে, কিন্তু মিলন কদাচিৎ যায়। মিলনের ফুলশয্যাও ঐ ঘরটাতেই হয়েছিল। কি কথা হয়েছিল, মনের কোনো কোণায় খুঁজে পায় না মিলন। ঘরটার কোনো মধুর স্মৃতিই ওর মনে গাঁথা নাই, একটা তিক্ত স্মৃতি লেগে আছে, সেটা হচ্ছে, নরুর জ্বর প্রথম ঐ ঘরেই হয়েছিল, তারপর বাড়াবাড়ি হলে নীচে নামিয়ে আনা হয়। মনে আছে সেই নামিয়ে আনার স্মৃতিটা! চার পাঁচজন ধরাধরি করে নিয়ে এল একটা অচৈতন্য মানবদেহ—দূর থেকে দেখেছিল মিলন। সেবাশুশ্রূষা কিছুই মিলনকে করতে হয় নি। মাঝে মাঝে এটা-ওটা যুগিয়ে দিত মাত্র—সে-সবের কথাও ভাল মনে পড়ে না—কিন্তু ঐ ঘরটায় যেতে ভয় করে মিলনের। মনে হয়, নরু হয়তো ঐ ঘরেই আছে এখনো—হয়তো গিয়ে দেখবে, পড়ছে, না হয় শুয়ে আছে, না হয় তো বাঁশী বাজাচ্ছে।

পারতপক্ষে যায় না মিলন ও-ঘরে। তালাবন্ধ আছে ঘরটা। কিন্তু আজ যেন সাহস হল। দিনের বেলা, ভয় কিসের? মরচে ধরা পুরোনো চাবিটা নিয়ে ও উঠে গেল ওপরে। খুললো গিয়ে ঘরখানা। পুরোণো বাড়ী, ইঁদুর-আরশুলায় ভর্ত্তি—সব শব্দ করে পালিয়ে গেল কে কোথায়। গা'টা ছম্ ছম্ করে উঠলো মিলনের—কিন্তু ঢুকলো! ভয়কে আজ অকস্মাৎ যেন জয় করে বসলো মিলন। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দুটো জানালা: তার মাঝখানের দেওয়ালে একটা বড় আয়না। নরোত্তম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতো, পোষাক পরতো! জানালা দুটোই খুলে দিল মিলন

দর্জ প্রথম। আলো এসে ওপাশের দেওয়ালের একটা ছবিকে আয়নায় প্রতিবিম্বিত করছে—তার সঙ্গে ওপাশের দেওয়াল-ঘেঁসা খাট-বিছানা-মশারী—সবই আয়নার মধ্যে—আয়নাতেই সেগুলোকে দেখে নিল মিলন। খাটি খাট-বিছানার পানে চাইতে ওর যেন কেমন ভয় ভয় করছে এখনো। নাঃ, কিছু নাই, শুধু বিছানাটা। এতক্ষণে চাইল ও খাটের দিকে। বিছানা পাতা, মশারী ঝোলানো—আর মাথার বালিশে শুয়ে নরোত্তমের ছোট্ট একটি ফটো। সাজিয়ে রেখেছে সুদাস। কখন সাজিয়েছে, জানে না মিলন—জানায় নি ওকে সুদাস। মিলন আজ দীর্ঘ দিন পরে এ-ঘরে এল।

দেওয়ালের গায়ে ক্যালেণ্ডার ঝুলানো—তেরশ' পঁয়তাল্লিশ সালের ক্যালেণ্ডার—পাঁচ-ছয় বছর আগের। নরোত্তমই এনে টাঙিয়ে ছিল! কাগজগুলো লালচে হয়ে গেছে—কিন্তু ওর মোটা বোর্ডটায় একটি মেয়ের ছবি রয়েছে,—সেটি ঠিক আছে—রং মলিন হয় নি। অজন্তা প্যাটার্ণের ছবি—সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এমন নিটোল যৌবন মাটির ধরণীতে কখনো জন্মেছে কি না, কে জানে! অজন্তা—সে বোধ হয় দেবতাদের দেশ। কিন্তু কাপড়-চোপড় পরে না কেন ওরা? শুধু গয়না আর গয়না। বাপ্! কত রকমের গয়না! মাথার চুল থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলটা অবধি খালি গয়নায় ভর্তি। অত গয়না পরে চলতে পারে তো ওদেশের মেয়েরা?—মিলন ছবিখানা দেখছে আর ভাবছে—দূর ছাই, কি সব ভাবছে! ও তো ছবি! অমনি করে এঁকে দিয়েছে। অত গয়না কি আর মানুষে পরে কখনো! মিলন দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁসা আলমারীটার দিকে চাইল। বইএ বোঝাই, কাচের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তালা লাগানো। সুদাস তালা দিয়ে রেখেছে। খাটের তলায় কি কতকগুলো মাসিক পত্র—থাক্, দরকার নাই ওগুলো ঘেঁটে আর। যা ধূলো জমেছে! একখানা চেয়ার, একটা টেবিল, একটা টুল মেঝের একপাশে দক্ষিণ দিকে। চেয়ারে বসলে

পশ্চিমের আকাশ, মাঠ-বন নজরে পড়ে, আর বাঁ দিকে তাকালে নদীর ওপার পর্য্যন্ত দেখা যায়। টেবিলের উপর একখানা মাত্র বই পড়ে আছে, মিলন উল্টে দেখলো—গীতা। নাঃ, পড়বার মত নাই কিছু। চলে যাবে মিলন, জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে যেতে হবে, নইলে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকবে ঘরে। এগিয়ে এল আবার এদিকে। বড় আয়নাটায় ওর ছায়া পড়েছে, সেই অজন্তার ছবিটার ছায়ার পাশেই মিলনের ছায়া। মিলনের মুখে পশ্চিম-আকাশের আলো এসে পড়েছে, ঝলমল করছে আয়নার মধ্যে। সেই তিলটা আরো কালো দেখাচ্ছে। ঐ তিলটাই অলক্ষুণে। মিলন পাঁজিতে দেখেছে, তিলতত্ত্ব—লেখা আছে "ওষ্ঠের তিল বিলাসিতা ও প্রেমিকতার চিহ্ন—" ছাই! বিলাস তো খুবই করলো মিলন এতকাল! আর প্রেমিকতা—হুঁ—প্রেম যেন গাছে ফলে! মিলন তিলটা আঙুল দিয়ে রগড়ে দিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যেন তিলটা। চাঁপা রংএর মুখে কালো বিন্দুটা দেখাচ্ছে দেখ—যেন ভ্রমর বসেছে একটা। মৃদু হাসলো মিলন উপমাটা মনে আসায়। দন্তরুচিও দেখা যাচ্ছে যে, ছিঃ ছিঃ—! ওম্মা, সব-কটা দাঁতই দেখা যাচ্ছে! নীচের ভাঙা আয়নাটায় এমন তো দেখা যায় না। আয়না আর একটা কিনে এনে দিল না সুদাস। সেই কোনকালের একটা চটাওঠা আয়না নিয়ে ওকে চুল বাঁধতে হয়! কাপড়, জামা, সেমিজ কিনে তো দেয়—আয়না একটা দেয় না কেন?—আশ্চর্য্য! কিন্তু মিলনও তো চায় নি কোনো দিন! চাইলে নিশ্চয় সুদাস দিত কিনে। এই ঝুলনের মেলাতে একটা কিনে নেবে।

এগিয়ে এল মিলন আয়নাটার দিকে। ওর কোমর অবধি ছায়া পড়ছে; পিছিয়ে এল খানিকটা—হাঁটু অবধি ছায়া পড়ল। আরো পিছিয়ে যাবে—কিন্তু খাটখানা রয়েছে—যাবার যায়গা নেই আর। খাটের উপর উঠবে, মশারীটা রয়েছে ঝুলে। একটু সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো—পা থেকে বুক অবধি দেখা যাচ্ছে, মাথাটা দেখা যায় না। খাটখানা উঁচু

রলেই এই রকম হচ্ছে! খাটের ওপাশে দেওয়াল-ঘেঁসে দাঁড়ালেই ঠিক হয়। খাটখানা সরাতে হবে। মিলন নেমে একটা পাশ ধরে টান দিল, ভারি খাট, শানের মেঝেতে শব্দ করলো একটা তীক্ষ্ণ—চমকে উঠলো মিলন নিজেই। যেন কারো আর্তনাদ! হয়তো নরোত্তমেরই! কিন্তু মিলনের বুকখানা আজ আশ্চর্য্য সাহসী হয়ে উঠেছে! তৎক্ষণাৎ সামলে নিল; ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো খাট আর দেওয়ালের মধ্যে। মশারীর জাল ভেদ করে দৃষ্টি আসছে না। দূর ছাই! টেনে গুটিয়ে ফেললো মশারী। এ যেন খেলা—কী এক মিষ্টি খেলা। এই খেলায় ওকে পেয়ে বসেছে আজ। এতক্ষণে মিলন দেখতে পেলে—হ্যাঁ, গোটা শরীরটাই দেখা যাচ্ছে, তবে হাঁটুর উপরের খানিকটা বাদ পড়েছে খাটের আড়ালে! তা হোক, তবু দেখা গেল। নিজের সমস্ত অবয়বটা মিলন কখনো দেখেনি এমন করে। সে যে নিজের কাছেই একটা দ্রষ্টব্য, এটা ও জানতো না। আজ যেন অকস্মাৎ জেনে ফেললো! খাটখানা আর সরালো না মিলন—বেরিয়ে এল ওখান থেকে! তেড়চা হয়েই রইল খাট, শুধু মশারীটা ফেলে দিল। আয়না দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা, ওর নীচে আবার তেল-সাবান-চিরুণী ইত্যাদি রাখবার জায়গা রয়েছে। ক্ষুর রয়েছে একখানা। নরোত্তম দাড়ী কামাতো ঐ ক্ষুরে। এখনো হয়তো কামানো যায়। মিলন ক্ষুরখানা খাপ থেকে খুলে বাঁ হাতখানা তুলে পরখ করতে যাচ্ছে, কাটে কি না—হঠাৎ,

—বৌমা!—

চমকে উঠলো মিলন আকস্মিক আহ্বানে। যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে! হাতটা কেঁপে গেছে, বাহুর পাশের একটু যায়গা কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

—যাই—বাবা! যাই—বলে তাড়াতাড়ি ক্ষুরটা রেখে মিলন দরজা বন্ধ করলো! ঐ খাটের শব্দেই শ্বশুর জেগে উঠেছে তাহলে।

কেন যে এমন বোকামী করলো মিলন! খাটখানা টানবার কি দরকার ছিল! শ্বশুর না ডাকলে থাকতো ওখানে আরো কিছুক্ষণ! মিলন নেমে এল নীচে। সুদাস বলল—কোথা ছিলি রে মা!

—ছাদে—বলে মিলন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নোয়াচ্ছে; কিন্তু সুদাস খুশী হয়েছে যেন—ঘরটায় মাঝে মাঝে ঝাড়পুঁছ করিস গে মা; ঐ ঘরে তোর সর্ব্বস্ব আছে···।

হ্যাঁ, আছে সর্ব্বস্ব। মিলন দেখে এল এখনি। কাটা বুকের রক্তটুকু না দেখতে পায়, এমনি ভাবে কাপড় ঢেকে মিলন বললো—তামাক দি বাবা—, বেলা নাই আর—! ওঠো।

ও যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। সুদাস এসে দেখলো চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—নাক ডাকছে। সুদাস নিঃশব্দেই ফিরে গেল। মন্দিরের সুমুখে দাঁড়ালো হুঁকো হাতে। বেলা এখনো রয়েছে; পড়ন্ত সূর্য্যের আলোতে মন্দিরের শীর্ষদেশ ঝিলমিল করছে। সুদাস উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘরে অন্য কেউ নেই। মিলন গা' ধুতে গেছে নদীতে। দূরের শ্যামসায়র থেকে এক কলসী জল নিয়ে এখনি এসে পড়বে। আজ আবার চুল বাঁধলো না মেয়েটা, বললো —আয়না ভাঙা বাবা, কিছুই দেখা যায় না—বিরক্ত লাগে।

আয়না একটা ওকে কিনে দিতে হবে। ঐটুকু মেয়ে—এত লম্বা চুল না আঁচড়ালে নষ্ট হয়ে যাবে যে! উপরের ঘরে গিয়েই না হয় বেঁধে আসতে পারতো চুল। গিয়েছিল তো আজ। আজ গিয়েছিল মিলন ঐ ঘরে। আজ বোধহয় ওর প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে স্বামীর ঘরটি দেখবার জন্য, তাই গিয়েছিল। খুশী হয়ে উঠছে সুদাসের মনটা। হ্যাঁ, বড় হয়েছে, বয়স বেড়েছে—এবার তো বুঝতে পারবেই। এবার ও বুঝতে পারবে,

ওর স্বামী আছে ঐ ঘরে, ঐ সমাধিতে, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তিতে—এই ঘরের ধূলোতে ধূলোতে সর্বত্র আছে নরু—মিলন নিশ্চয় এবার সেটা বুঝেছে। কিন্তু আজই কেন বুঝতে পারলো! এটা কি আকস্মিক? না, কোন একটা হেতু হয়েছে আজ! সুদাস অতীতের ইতিহাসকে প্রশ্ন করলো—নরুকে কখনো খাবার সাজিয়ে দেয় নি মিলন—দেবার অবসর পেল না। নরুর কাছে কখনো ভাল কাপড়-জামা পরে বেরুতে পায় নি মিলন;—কারো কাছেই না, কোনো পুরুষের কাছেই না। বেরই হয় না মিলন। গাঁয়ে যাত্রা, থিয়েটার, কীর্ত্তন, কবিগান যদি-বা কিছু হয় তো মিলন শুনতে যাবার আগ্রহ কদাচিৎ প্রকাশ করে। যদি যায় তো বিশেষ সাজ-গোজ কিছু করে না। সুদাস তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়, মেয়েদের দলে বসিয়ে দেয়, আবার সঙ্গেই ফিরিয়ে আনে! পাড়ায় আরো দুচার ঘর স্বজাতি আছে। কিন্তু মিলনের সঙ্গে কারো তেমন ভাব নেই—, একাই থাকে মিলন, কাজ আর বই আর পূজো নিয়ে। কিন্তু ঐটুকু বয়সে ওর এমনটা হওয়ার কারণ কি! কারণ ও জানে ওর দুর্ভাগ্যের কথা; ওর ব্যর্থ জীবনের মর্মান্তিক দুঃখই ওকে এমন অনাসক্ত করে দিয়েছে। ভালোই করেছে। আয়না ভেঙে গেছে—তা কোনো দিন সুদাসকে বলে নি ও। আজই কি বলতো নাকি! বলতো না। চার পাঁচ দিন চুল বাঁধেনি দেখে সুদাসই বললো বাঁধতে চুল—তাই না বললো মিলন আয়নার কথাটা! আচ্ছা মেয়ে কিন্তুক! আয়না একটা এখনি কিনে আনবে নাকি সুদাস!

সুদাসের মনটা আনন্দাপ্লুত হচ্ছে। তার নরুর জন্য নরুর বৌ কী অসীম নিষ্ঠায় সংযত হয়ে থাকে—স্নান করে, পূজো করে, ধর্মপুস্তক পাঠ করে, প্রার্থনা করে যেন আগামী জন্মে আবার নরুকে পায়। পাবেই তো! জন্ম-জন্মের সম্বন্ধ—ও কি ঘুচবার! তাই হোক মা—জন্মান্তরে তুই যেন নরুকেই লাভ করিস!

ওবাড়ীর রাধারাণী এসে ডাকলো—জেঠামশাই! বৌদি কৈ? গা ধুতে গেছে!

—হাঁ—বলে ফিরে তাকালো সুদাস। উনিশকুড়ি বছরের মেয়ে—এই সেদিন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। শ্যামলা মেয়ে, দোহারা গড়ন, লম্বা। পরণে একখানা রামধনু রংএর শাড়ী—খোলা মাথা, ঝুঁটি বেঁধেছে, ঠিক যেন একখানা প্রকাণ্ড কালো জিলেপী—। পাকে পাকে বসিয়েছে কাঁটা আর সাদা রংএর কি সব—তার উপর জাল দেওয়া, তাতে লেখা "রাধা"। বেশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, যেন একটা রজনী গন্ধার শীষ। রাধা এগিয়ে এল ঘরের উঠানের দিকে! বললো,

—কতক্ষণ গেছে? আমার সঙ্গে ওর দেখাই হয় নাই এখনো!

—আসবে এখুনি—এই তো গেল—বোস্।

সুদাস একটা নিশ্বাস ছাড়লো—অকারণ, হয়তো-বা কিছু কারণ আছে। হুঁকোটা হাতে নিয়ে তমাল গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। ঝিঙএ লতার ফুলগুলো ফুটে আসছে। সন্ধ্যার দেরী নাই—"আর বেলা নাই সন্ধ্যা হোল, ফুটলো ঝিঙএর ফুল"—সুদাসের মনে আকস্মিক ভাবে এই পুরোনো গানের কলিটা গুঞ্জরিয়ে উঠলো। ঝিঙএ ফুল গুলো ফুটলো, ওদের অভিসার-রজনী সমাগত। ভ্রমরকে ওরা স্বাগত জানাচ্ছে। ওদের যৌবন পরিপূর্ণি লাভ করেছে—একটি রাত্রের যৌবন, কিন্তু তারই মধ্যে কত বিপুল সার্থকতা! কাল সকালেই ওরা ঐ সমাধির উপর ঝরে পড়বে, নরু যেখানে ঘুমাচ্ছে;—নরু—যৌবনের দীপ্ত বহ্নি যার কাল নিদ্রায় নিবে গেছে—তার সমাধির উপর কিনা ঐ যুবতী ফুলগুলো কেলি করবে—ভ্রমরবিলাসে রজনী জাগবে—রাত্রির একটি মুহূর্তকেও ওরা ব্যর্থ হতে দেবে না। না ঠিক, ওরা সার্থক হোক—কিন্তু নরুর সমাধির উপর কেন! না—সুদাসের এ যেন অসহ্য লাগছে। এমনি করে মিলনও যদি কোনো দিন এই গৃহের ধ্বংসস্তূপে তার কেলিবিলাস-শয্যা

রচনা করে! —না—না—না—সুদাস এ হতে দেবে না! ডান হাত দিয়ে সুদাস ঝিঙএ লতাটা ধরলো ছিঁড়ে উপড়ে ফেলবার জন্ত।

—বাবা!—মাচান করবে না কি?

সিক্তবসনা মিলন কলসী কাঁখে ঘরে ঢুকলো। ত্রস্তে লতাটা ছেড়ে দিয়ে—হাঁ—দেখি—বলেই সরে এল সুদাস ওখান থেকে! লতাটা উল্টে গেছে, মলিন দেখাচ্ছে! মিলন একমুহূর্ত্ত চেয়ে ঘরে ঢুকলো গিয়ে। ওর সিক্ত শাড়ীর ঝরা জলে সদর দরজা থেকে ঘরের ভেতর পর্য্যন্ত আল্‌পনা আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

হুঁকোতে কয়েকটা জোর টান মেরে সুদাস চেঁচিয়ে বলল—ঝগড়ুকে ডাকি আমি!—ঝগড়ু সাঁওতাল সুদাসের সেই বিঘে সাত-আট জমির চাষ করে। তাকেই ডাকতে গেল সুদাস! পশ্চিমদিকের বড় তালপুকুরটার ওপাশেই নদী কিনারে ওদের অস্থায়ী আশ্রয়। মিনিট দশেকের পথ। সুদাস হুঁকো হাতেই চললো। কি যে দরকার তা যেন জানা নেই, অথচ দরকার একটা কিছু আছে। ও হ্যাঁ, ঐ ঝিঙএ লতাটায় মাচান দিয়ে দেবে ঝগড়ু। তমালগাছেরই একটা ডাল না হয় বানিয়ে পুঁতে দেবে ওখানে। কিন্তু তমালের ডাল আবার বৈষ্ণবের বানাতে নেই। অন্য কিছু দিতে হবে তাহলে! সুদাস যাচ্ছে, পাড়ার একটা ছোঁড়া, নরুরই সমবয়সী, বলল—কোথা যাবে কাকা?

—দেখি ঝগড়ুকে—সুদাস চলতে লাগল হন্‌হন্ করে, যেন মুমূর্ষু রোগীর জন্ত ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে। এত তাড়া কেন? নিজের মনকেই প্রশ্ন করলো সুদাস। উত্তরও পেল—মিলনের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে ঝিঙএ লতাটা সুদাস ছিঁড়তে যায় নি,—মাচান করে দেবারই চেষ্টা করছিল। কিন্তু কী তার প্রয়োজন! মিলন তো কোনো কৈফিয়ৎ চাইবে না; [illegible] কি, ছিঁড়ে দিলেও কিছু বলবে না মিলন—তবে কষ্ট পাবে মনে! ঐ গাছগুলো ঐ মিলনই লাগিয়েছে ওখানে। নরুর

দেহের সার-মেশানো মাটিতে ওগুলো এমন ঝাড়ালো হয়ে উঠেছে! ওঃ!" নরুর বুকের হাড়েই গজাচ্ছে বুঝি ঐ লতাগুলো—না, ওদের জন্য মাচান করার কোনো দরকার নেই। মিলন যা ইচ্ছে ভাবুক, নরু যেন বোঝে, তার বাবা ছেলের দেহটাকে আজো ভালোবাসে—সুদাস ঘরমুখো ফিরে আসতে আরম্ভ করলো।

সেই ছোঁড়াটা আবার জিজ্ঞেস করে যদি—সুদাস ঝগড়ুর বাড়ী অবধি গেল না কেন? তাহলে উত্তর কি দেবে সুদাস? কিন্তু ছোঁড়াটা নাই, কোথায় চলে গেছে এর মধ্যে। ভরা যৌবনের চঞ্চল মন—ওরা কি একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারে! কিন্তু কোথায় ছেলেটা? সুদাসের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুদাসের বাড়ীর দিকেই যায় নি তো! সুদাস পায়ে জোর দিল! মিলন একা আছে, আর আছে মাধব—ঘুমুচ্ছে, কিন্তু জাগতেও তো পারে। কিন্তু রাধারাণী আছে—আছে নিশ্চয় এখনো—অতএব ভয়ের কোন কারণ নেই। সুদাস গতিবেগ কমালো—হাঁফাচ্ছে সুদাস।

ক' দিন আর এমন করে আগলাবে ও মিলনকে? ক'টা দিনই বা আছে বাকি ওর! আছে—বাকি আছে এখনো ওর ছুটি ফুরোবার। ওর বাবা নব্বোই বছর বেঁচেছিল, ঠাকুর দা' প্রায় একশ' বছর—সুদাসও কমসে-কম আশী পেরোবে—এই তো মোটে তেষট্টি চলছে তার। বাকি আছে এখনো; সুদাস হিসাব করলো—সতেরো বছর বাকি, [illegible] আশী ছাড়িয়ে যায় তাহলে আরো বেশি। মিলন ততদিনে [illegible] হয়ে যাবে, মানে—চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছবে; ওর দেহের [illegible] ভাটা পড়বে, জীর্ণ হয়ে যাবে নিটোল মসৃণতা—শুকিয়ে যাবে লা[illegible] তখন আর ভয় করবার কিছু থাকবে না!

—বৌমা!

সুদাস বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলো। সমাধি[illegible]ল [illegible]

[illegible] মিলন ধূপ-দীপ হাতে বেরিয়ে আসছিল। এখনো দিনশেষের শেষরশ্মি তমালগাছটার মাথার পাতাগুলোতে জলছে, কিন্তু মিলন এমনি সময়েই প্রদীপ জ্বালে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো উঠানে। সুদাস দেখে বললো—যাও, সন্ধ্যাটা দিয়ে এস।

মিলন কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল সমাধির দিকে। প্রদীপ দিল, প্রণাম করলো, তারপর ঝিঙএ-লতাটি ছোটছোট আঙুল দিয়ে পরম যত্নে সোজা করে আবার তুলে দিল একটা শুকনো ডালে! মাথার চুলগুলো রুক্ষ রুক্ষ হয়ে উঠেছে ওর। পরনের কাপড়খানা আধময়লা। গায়ের জামাটা সেই কোন্‌কালের খদ্দরের—ছেঁড়া। হাতের চুড়িগুলোর রং চটে গেছে! কেন? এরকম কেন হয়ে আছে ও!

রাধা তখনো উঠানে দাঁড়িয়ে। নদীর হাওয়াতে ওর রঙিন আঁচলটা দোল খাচ্ছে। দৈহিক সৌন্দর্য্যে মিলনের কাছে ও দাঁড়াতে পারে না কিন্তু এখন যেন ওকে অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। সুদাসের অন্তর বেদনা-আর্ত্ত হয়ে উঠলো অকস্মাৎ। ঐ তো নরুর কাছে মিলন দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ, নরুর কাছেই। নরু দেখছে তার বৌকে—মলিনা, বিরহক্লিষ্টা। কি মনে করবে [illegible]? ছিঃ ছিঃ! সুদাস স্নেহের কণ্ঠে তিরস্কার করলো, —তোর [illegible] করে মা মিলন! ময়লা কাপড় কেন পরেছিস? যা, [illegible] দেখছিস [illegible] মা রাধা, কাণ্ডটা দেখ একবার বেটির।

[illegible] কোণায়। সংক্ষেপে বললো—কাচা কাপড়

[illegible] তোর?

[illegible] পরলুম এখন

[illegible] আর এক[illegible] ঐখেনে। যা বলছি!

[illegible] মিল[illegible] ঘরে এসে ঢুকলো কাপড়

ছাড়বার জন্ত ! রাধাও এল ওর সঙ্গে। আসতে আসতে বললো—আয়, বৌদি, চুলটা আঁচড়ে দি—তেল যে একটুন !

—দূরছাই ! থাকগে।—বললো মিলন !

; কিন্তু রাধা ছাড়লো না। নিজেই তেল, চিরুণী বার করে মিলনের মাথার চুলগুলো আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দিল, গামছা দিয়ে মুখখানা মুছে দিল—তারপর একখানা গেরুয়া রঙএর শাড়ী পরিয়ে দিয়ে বললো, —যা এবার। যে দেখবে সেই মালা পরিয়ে দেবে !

—যাঃ, অসভ্য মেয়ে কোথাকার ! মালাই পরছি আর কি আমি !

—কেন ! পরবি না কিসের লেগে ? আমাদের বোষ্টুমের ঘর। এই আমিই তো পরেছি ; দেখ !

মিলনের মনে ছিল না রাধার দ্বিতীয় বিবাহের কথাটা ! মনে পড়ল, বছর দুই পূর্ব্বে বিধবা রাধা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হয়েছে শাহাপুরের মোহান্তদের ঘরে। মোহান্তরা নামজাদা লোক—রাধাকে তারা সসম্মানে ঘরে নিয়ে গেছে। অবশ্য বরও বিপত্নীক ছিল ! ছিল তো কি বয়ে গেছে রাধার !—বেশ তো আছে। ওর মুখের কোনো রেখায় অতৃপ্তির এতোটুকু চিহ্ন নাই। সগৌরবে ও সীঁথিতে সিঁদুর লেপে রঙিন শাড়ী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! ওর শ্বশুরবাড়ীর কথাই এতক্ষণ ধরে ও শোনাচ্ছিল মিলনকে, স্বামীর আদরের কথাও। বয়স্ক স্বামী—ওকে নিয়ে কি যে কাণ্ডটা করে, কত ঢলাঢলি, কত লজ্জাকর কাণ্ড, কত কি ! কিন্তু সব কথা বলবার সময় পায় নি, আরো বলবে, বলতে চায়—[illegible] জন্তই এসেছে ও। কেই-বা না বলে ! শ্রীরাধাও তাঁর সখীদের কাছে রাত্রের ব্যাপারের রসোদ্গার করতেন। বিদ্যাপতি সব খুলে লিখে গিয়েছেন। হোকনা সে-সব ঠাকুর-দেবতার কথা, মানুষের মনটাও তো ঠাকুর দেবতার মন দিয়েই তৈরী ! চণ্ডীদাস বলেছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য··· ?" কেন বলেছেন ? বলেছেন এইজন্তে যে মানুষ আগে সত্যি হলে তবে

তো দেবতাদের সত্যতা বুঝতে পারবে—মানুষের মন সত্য হলে তবে তো দেবতার সত্য যে অনুভব করতে পারবে! মানুষের মনে প্রেমের সত্য আছে বলেই তো শ্রীরাধার প্রেম—বিরহ—মিলন মানুষ বুঝতে পারে! আগে মানুষ বুঝবে নিজকে, তবে তো নিজের মধ্যে দেবতাকে বোধ করবে—মিলন মহাপ্রভুর জন্য ধূপদীপ সাজাতে সাজাতে ভাবতে লাগল। কিন্তু রাধার অতশত ভাবনার বালাই নাই, বলে উঠলো, —তোর চেহারাটা আশ্চর্য্যি খুলেছে বৌদি!

ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটলো মিলনের। হাসবার সময় ওর ঠোঁটদুটো বেঁকে বাঁদিকে টেরচা হয়ে যায়—নীরব, নরম হাসি, কিন্তু ভারী সুন্দর দেখায় ভঙ্গীটি। সরব হাসতে ওকে কেউ দেখেছে বলে মনে পড়ে না কারো। রাধা নিজের কপালের সিনেমা-টিপটা তুলে ওর কপালে টিপে লাগিয়ে দিয়ে বললো—কি যেন খুঁৎ ছিল, এতক্ষণে ঠিক হয়েছে। বুঝলি?

—ধ্যেৎ—বাঁ হাতের মুলো দিয়ে টিপটি খুলে ফেলতে চাইছে মিলন—কিন্তু ধূনোর আঁটা জমাট হয়ে লেগেছে। প্রদীপ আর ধূপে ওর হাত জোড়া; মিলন মাথার ঘোমটাটা লম্বা করে টেনে দিল ঐ মুলো দিয়েই—তার পর বেরিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। সুদাস হয়তো হাতমুখ ধুতে গেছে। নিশ্চিন্ত হোল মিলন খানিকটা। টিপ-পরা মুখ ও সুদাসকে কিছুতেই দেখাতে পারবে না। পিছনে রাধাও আসছে। পিঠের দিক থেকে ঘোমটাটা টেনে নিল—আঃ, কি করিস ভাই!—বলে মিলন যেই বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়েছে, বৈঠকখানার ছোট জানালার ওপাশে একজোড়া চোখের সঙ্গে চোখাচোখী হয়ে গেল তার।

হোঁচট খেয়ে গেল যেন মিলন। ভাগ্যিস হাত থেকে ধূপদীপ পড়ে যায় নি। সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকলো গিয়ে। গোধূলির তরল আলো—পশ্চিম আকাশের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহের আভা—আর মন্দিরের

ক্ষীণ দীপশিখার মিটিমিটি কাঁপা রশ্মি একসঙ্গে লাগল মিলনের মুখে—যখন সে [illegible] ফিরে গড় হয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে। মাধব এর মধ্যে কখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকিয়ে রয়েছে এই দিকেই। মিলন মুখ নামিয়ে ঘোমটা টানলো অনেকটা। রাধা রয়েছে রোয়াকের নীচেই, কিন্তু মাধবকে ও চেনে না—তাই কোনো কথা বলে নি তার সঙ্গে। মিলন মন্দির থেকে নেমে সমাধিটার দিকে চলে গেল, মাধবকেই এড়াবার জন্য হয়তো! রাধাও গেল সঙ্গে। মাধব কুয়োতলায় এসে এক বালতি জল তুলে মুখ ধুতে লাগলো।

ঘুমিয়েছিলো মাধব অনেকক্ষণ। কখন যে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছিল কে জানে, কিন্তু জাগলো একেবারে সন্ধ্যা হলে। এবার এককাপ চা খেতে হবে মাধবকে। এরা বোধহয় চা খায় না। সুদাস নিশ্চয়ই খায় না, বৌটাও খায় বলে মনে হয় না। গাঁয়ে কোথাও দোকান-টোকান যদি থাকে—না হলে চা-চিনি কিনে এনে দেবে—বলবে—তৈরী করে দিতে। কিন্তু সেটা কি উচিৎ হবে! নিজের পয়সা দিয়ে চা—চিনি কিনলে সুদাস চটবে, বলবে—"আমি কি চা দিতে পারতুম না।" দেখা যাক, গাঁয়ে যদি দোকান থাকে তো খেয়ে এলেই চুকে যাবে সব ঝঞ্ঝাট। মাধব কটকী জুতোজুটো পায়ে গলিয়ে নিতে নিতে জোরে বলল—আমি একবার গ্রামটা ঘুরে আসছি, মামাকে বলো—মাধব বেরিয়ে গেল সদরের পথে।

—কে লো বৌদি, উ কে?

—কে জানে গা ভাই! এসেছে সকালে। শুনলুম নাকি বাবার কিরকম সম্পর্কে ভাগনে হয়।

—ওঃ, যাত্রার দলটল করে নাকি! অমন চাচর-চাচর চুল!

—তাইবা কি করে জানবো! শুনলুম, বিন্দেবন, মথুরা, নীলেচল; এই সব তীর্থ করে এসেছে!

—হুঁ ! তাহলে বল 'গোসাঁই।' চাউনি [illegible] তাই [illegible] [illegible]। বেশ চোরা-চোরা চাউনি।

—চাইছিল নাকি তোর দিকে ?—কৌতুক হাসিতে [illegible] হয়ে উঠলো মিলনের মুখখানা !

—আমার দিকে !—হুঁ ! তু' থাকতে আমার দিকে চাইবে কে লো' বৌদি—হীরের কাছে জিরে ! হুঁ !

—কৈ, আমি তো চাইতে দেখি নাই। আপনার লোক এসেছে, কাল চলে যাবে, অতসব ভাবিনা আমি !

—অত-সবই ভাবতে হয়, বুঝলি বৌদি ! মানুষের মতন খারাপ জন্তু আর নাই। বই পড়ে তু' কি আর শিখবি ? আমি কিছু-না-পড়েই এই বয়সে যা শিখলুম—বুঝলি—বলি তো তাক লেগে যাবে তুর। উ লোকটি খুব যে সাধুসন্ন্যেসী নয়—তা আমি বলে রাখলুম বৌদি,—দেখিস !

—যা খুসী হোক গে না, আমার কি ! চল, ঘরে যাই।—আয় লো !

—চ' যাই ! মানেকথা কি জানিস্—আর ইদিকে, শুন, তুর উপর নজর দিয়েছে, তা করুক না মালাচন্দন !

—ধ্যেৎ ! ফাজিল ছুঁড়ি কুথাকার !—মিলন বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেললো—সবাই তোর বরের মতন কিনা !

—ওরে বাবা ! ই লোক আরো শয়তান। ঐ জাতটোই শয়তান। জানিস বৌদি—চল, তুখে বলি, চল।

মিলনকে জড়িয়ে ধরে টানছে রাধা ঘরের দিকে। মিলন বলল—দাঁড়া, সলতেটা উস্কে দিই।—সলতেটা উস্কে দিয়ে মিলন আর একবার গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করছে। রাধা বলল—

—তু' কিন্তুক পারিস বৌদি ! আমারও তো শিবঠ পকেরটা [illegible] একদিন দেখতেও যাই নাই আমি ; মনেই পড়ে না তার কথা—[illegible]ও মনে নাই আমার। কি বলে তু' পেন্নাম কচ্ছিস বৌদি ? বল,

পিসগিন্নির ভুর যেন একটো মালাচন্দন হয়ে যায়। বল্, শুনি আমি, বল দেখি!

হেসে ফেললো মিলন আবার। উঠে বললো—আমার মালাচন্দনের লেগে তোর এত ভাবনা কেন বল দেখি?

—দরকার বৌদি—নাহলে তু' ভেসে যাবি। ই আমি বলে রাখলুম। তুর চেহারাতে যে রকম জলুস লেগেছে—ই সুময়টো মানুষ কাটাতে পারে না। তু' যদি পারিস তো তু' সতী-সাবিত্তি থেকে বেশি। কিন্তুক পারবি না। আমি পারি নাই। সাধে কি আর সাত-তাড়াতাড়ি বাবা আমার মালাচন্দন করালো? বুঝতে পেরেছিল মা আর বাবা—না হলে আমি হয়ত…

—কি করতিস?

—কি করতুম, কে জানে!

আবার মিলন হেসে উঠলো ওর কথায়। মেয়েটা বলে কি? রাধা তখনো বলছে—মাইরি বৌদি, তুখে বলবের লেগে পেট আমার হাজোড় পাঁজোড় করছে। আয়, বলবো সব কথা।

ফিরবার জন্ত পা বাড়াতেই মিলন দেখলো, সুদাস মন্দিরে ঢুকছে। —বৌমা—

—যাই বাবা!—মিলন তাড়াতাড়ি এসে মন্দিরের রোয়াকে উঠলো। সুদাস শুধুলো,

—মাধব কৈ?—দুটো কাগজের মোড়ক দিল সুদাস মিলনের হাতে।

—কোথায় যেন গেলেন।

—ওঃ! আচ্ছা, আসুক। এই চা আর চিনি আছে। ও খায় চা, ফিরে এলে তৈরী করে দিও।

সুদাস আসনটা টেনে নিয়ে সন্ধ্যারতি করতে বসছে, হঠাৎ ইন্দুরের সঙ্গে বললো—টিপ কোথায় পেলিরে মা!

—এই ঠাকুরঝি পরিয়ে দিলো—বলতে বলতেই মিলন টিপটা খুলে ফেললো কপাল থেকে। ওটা যে কপালে আছে, সেকথা ভুলেই গিয়েছিল মিলন। লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো ও। কিন্তু সুদাস স্নেহের র্ভৎসনা করলো—বেশ তো ছিল! খুলে দিলে কেন। আমার কাছে একটু ভালো সেজে বুঝি থাকতে নেই!

—না বাবা, এসব আমার পরতে নাই আর!

—খুব আছে। কিসের লেগে নাই? দেখো তো জেঠা—উ যেন তিন কুড়ি বছর পার করেছে!

রাধা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বললো কথাগুলো। সুদাস ওকে সমর্থন করে বলল—না মা, অমন ঝি'র মতন থেকো না তুমি; নরু আমার দুঃখু পাবে।—আচমন করে মন্ত্র আওড়াতে লাগলো সুদাস। রাধা বাইরে দাঁড়িয়ে, আর মিলন ঐ আসনের পাশেই আর একটা কুশাসনে বসে। শাড়ীর অলস আঁচলখানা পাশে পড়ে আছে। মিলন তাকিয়ে রইলো শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের পানে। টানা-টানা দুটি চোখে যেন চাইছেন মিলনের দিকেই। টিপটা বাঁ হাতের তর্জ্জনীতে রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে নাড়ছিল মিলন—কখন আনমনে কপালে বসিয়ে দিল—তারপর আবার খুলতে গেল।

—থাক্—থাক বৌদি! রাধা আবেদন জানাচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় হাসলো মিলন ক্ষীণ হাসি!

—থাক্—কথাটা শুধু ঠোঁটে নড়ল, গলায় বেরুলো না। নিঃশব্দে বসে রইলো মিলন। রোজই থাকে এমনি করে বসে। এটা ওর নিত্যকার কর্তব্য। সন্ধ্যারতি শেষ হলে তবে ও ঘরের কাজে যায়। কোনো কোনো দিন বা একটা কীর্ত্তন গাইতে বলে সুদাস—গাইতে হয়। আজ যদি [illegible]—না, আজ মিলন গাইতে পারবে না। তার গান দেবতাকে শোনানো যায়—শত্তরও শুনতে পারে, কিন্তু ঐ যে এসেছে, কি যেন নাম,

মাধবদাস—ও যদি এসে পড়ে! ওকে গান শোনাতে পারবে না মিলন।

সুদাস দাঁড়িয়ে আরতি করতে লাগল; দাঁড়িয়ে উঠলো মিলনও। দরজার পাশে রাধা আর রোয়াকের নীচে কখন এসে দাঁড়িয়েছে মাধব—মিলনের চোখ পড়ল; মস্ত ঘোমটা টেনে দিল মিলন। আরতি শেষ করে সুদাস বাইরে তাকিয়েই দেখে বললো—চা খাও তো তুমি? যাও বৌমা, চা তৈরি করে দাও!

প্রণাম করে মিলন নিঃশব্দে চলে গেল রান্না ঘরে—সঙ্গে রাধা। ওদিকে মাধব মন্দিরে উঠে তানপুরাটা টেনে নিয়ে ঝঙ্কার দিচ্ছে—কয়েকটা টুং-টাং করেই গান ধরলো—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না…।
আমার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না…"

চমৎকার গলা! কিন্তু এ কী গান? চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—ওদের কারো পদ নয় তো! কিন্তু ভারী মিষ্টি, ঐ যে গাইছে—

"বিশ্বে তোমার লুকোচুরি, দেশবিদেশে কতই ঘুরি
বলো এবার হৃদয় মাঝে দেবে ধরা—ছলবে না…
আড়াল দিয়ে…"

মিলন পরম বিস্ময়ে শুনছে। এমন সুন্দর গান আছে নাকি? কি চমৎকার কথাগুলি!

"জানি আমার কঠিন হৃদয়, চরণ রাখার যোগ্য সে নয়—
তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না।
—অমন আড়াল দিয়ে"

সুন্দর—সত্যি সুন্দর! রাধাও শুনছিল, গানটা শেষ হতেই বলল, —বুঝলি তো বৌদি!

—কি ?

— তুখেই বলছে—"তুমার হাওয়া লাগলে হিবে"—বা, হাওয়া কর গা, বা···উ মানুষটি শয়তান বৌদি !

মাধবের উপর এই মেয়েটার অকারণ অভিযোগ শুনতে মিলনের ভালো লাগছে না—বলল,

—খামুকা লোককে খারাপ ভাবিস কেন ঠাকুরঝি—বড্ড বদ স্বভাব তোর !

—ওম্মা ! আচ্ছা, আমার কথা তা'হলে রেখে রাখিস !—গম্ভীর হয়ে গেল রাধা।

চা তৈরী হয়ে গেছে। একটা কাঁসার গেলাসে মাধবের জন্য ঢেলে নিয়ে রাধাকে বাটিতে একটু দিয়ে মিলন বললো,

—তু' খা একটু—বলে মিলন মন্দিরের দিকে এল। মাধব ওর হাত থেকেই নিল গেলাসটা। নামিয়ে দেবার অবসর দিল না।

ফিরে এসে মিলন দেখলো, রাধা ঠায় বসে আছে। চা ছোঁয় নি। রাগ করলো নাকি ? শুধুলো—

—খাবি না চা ?

—আয়, দুজনায় ভাগ করে খাই।

—আমি চা খাই না।

—খেলিই-বা একটুস্। জাত্ যাবে না। নে।—রাধা জোর করে চায়ের বাটিটা ওর মুখে ধরলো। খেল মিলন এক ঢোক দু'ঢোক। এর পর রাধা নিজে দুঢোক গিলে আবার দিল মিলনের মুখে, বললো,

—নে। / তুর জাত তো মেরেই দিলুম।

হেসে [illegible]আর এক ঢোক গিলে মিলন বললো—আর না ভাই ; তুই খা !

—[illegible] খাব দিতে নাই, দুষমন হয়—নে আর এক ঢোক।

[illegible] হোল মিলনকে। রাধা বললো—জানিস্, আমার উ' এখন

শয়তান—ওখেনে তো বাজার-গাঁ—দোকানে মাসের ঝোল খেয়ে আসে-ডিম খায়—সব খায় বদমাসটা!

—ডিম খায়? মাংসও খায়?—মিলন বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনার জ্বালাই অনুভব করলো যেন। ওর স্মৃতির দাহন!

—হুঁ—হুঁ—আমাকেও খাওয়ায়। পকেটে করে নিয়ে আসে। বলে কি জানিস? বলে—'বৌএর কাছে নিরামিষ খেয়ে আসা চলে না'—এমন বজ্জাৎ ভাই, বলে কি···একটা অশ্রাব্য কথাই বলে বসল রাধা। মিলন মুহূর্ত্তের জন্ম কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, এবার লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়; এসব কথা শুনতে মিলন অভ্যস্থ নয়। ওর জীবনের তরঙ্গ পুকুরের জলের মত—কোথাও জোরে আছাড় খায় না। আজ যেন একটা ঝড় উঠে সেই পুকুরেই ঢেউ তুলে দিল। সলজ্জ হেসে বললো,

—দূর ছুঁড়ি—যা; পালা। ঘরকে যা এবার। আমার রান্নাবাড়া আছে। ঘরে অতিথ্ রয়েছে।

মিলন উঠে মন্দিরের দাওয়া থেকে মাধবের এঁঠো গেলাসটা আনতে গেল। রাধাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বললো—আজ চল্লুম বৌদি, কাল আবার আসবো জ্বালাতে।—ও চলে গেল। সুদাস কোথায় যেন গেছে। রোয়াকে একা বসে মাধব। গেলাসটা নিচ্ছে মিলন। মাধব বলল,

—সুন্দর চা করেছো—তুমি খাও নাকি চা?

—না।—প্রথম কথা! প্রথমতম কথা মিলনের মুখ থেকে শুনলো মাধব। মিলন চলে আসছে।

—টিপটা ভালো করে বসে নি যে, এসো, এঁটে দিই—মন্দিরের দীপালোকে মিলনের মুখ দেখতে পাচ্ছে মাধব।

—থাক্—মিলন যেন দৌড়ে পালিয়ে এল। টিপটা খুলে ফেললো কপাল থেকে। বুকের ভেতরটা কাঁপছে এখনো দুরদুর করে; পা-হাতগুলোও কাঁপছে। ওকে যেন তাড়া করেছিল কেউ। আশ্চর্য্য! কেউ নি

দেখতে পেতো? কেউ যদি শুনতে পেত ওর কথাটা! রাধা সত্যি গেছে তো?···নাকি আড়ি পেতে শুনে গেছে? সুদাস ফেরে নি তো? শুনতে কেউ পায় নি নিশ্চয়ই! মিলন রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখলো···না, সুদাস ফেরে নি···মাধব একলা গুণগুণ করছে গানের একটা কলি?···ওই তাহলে তখন হেসেছিল, সেই দুপুর বেলা। হ্যা, ও ছাড়া আর কে? লোকটা তো সত্যি ভালো নয় তাহলে! রাধার কথাই ঠিক। রাধা মানুষ চেনে। চিনবে না কেন! এই বয়সে দু'দুটো বর নিয়ে ঘর করলো। এ বরটা আবার দোজবরে। ধরতে গেলে রাধার তিনটে বর। একটা খবিশ্তি কোন্‌কালে মরেছে। কিন্তু তার পর যখন ঐ ওপাড়ার ক্ষুদ ময়রার সঙ্গে ভিড়তে গেল, তখনি তো ওর মা-বাপ সামলে নিল মেয়েকে! মা-বাপ থাকলেই সামলায়। মিলনকে আর কে সামলাবে? নিজেকেই দেখতে হবে নিজের।

কপালের টিপটা হাতেই ছিল। জানালার চৌকাঠে এঁটে রেখে দিল সেটা। তারপর রান্নার আয়োজনে লাগল। সুদাস ভাতই খায় রাত্রে, কিন্তু ও কি খাবে? ঐ লোকটা! ওকে কে যাবে জিজ্ঞেস করতে? খায় খাবে ভাত, না খায় না খাবে। মিলন লুচি-পরোটা বানাতে পারবে না। রাগের বশে তিনজনের বেশি চাল দিয়ে বসল মিলন হাড়িতে।

এ বেলা মাছ নাই, তবে তরকারী আছে, হাট থেকে সুদাস কিনে এনেছে অনেককিছু! রান্নাটা আবার ভালো না হলে ঐ দিল্লী-বোম্বাইফেরৎ লোকটির মুখে রুচবে না। যত্নকরেই রাঁধতে হবে তাহলে! আনাজগুলো কুটে নিচ্ছে মিলন···লোকটা আবার গান ধরলো!

মুক্কিল রে বাবা···আঙুলটাই কেটে ফেলতুম এখনি—আপনার মনে বললো মিলন। —এমন আনমনা কেন যে হচ্ছি আমি! না, শুনব না ওদিকে, ভারী তো গান—কথাই বোঝা যায় না। আগেরটা বরং বেশ ছিল।

কী যে গাইছে ! এটা কোন্ দেশের গান আবার ? সুরটি কিন্তু বেশ··· বেশ সুরটি ।

আনাজ কোটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে মিলনের । হাতদুটি স্থির !

—বৌমা···!

সুদাস ফিরে এসেছে । একটা পেতলের ঘটিতে বঁটি ঠুকে শব্দ করে সাড়া দিল মিলন । ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল তারপর । সুদাস একটা মাছ এনেছে, প্রায় আধসের খানেক রুইবাচ্চা ; নিজের হাতে মাছটা এনেছে সুদাস অথচ মিলন জানে,—সুদাস মাছ, ডিম স্পর্শ করে না । আশ্চর্য্য হতে গিয়ে বেদনাহত হয়ে উঠলো মিলন । কি এমন ঘটলো, যার জন্য এই বৃদ্ধের আজ এতখানি পরিবর্ত্তন ? ওর মনের কোন্ তন্ত্রীতে কতখানি আঘাত লেগেছে, বুঝবার চেষ্টা করছে মিলন । সুদাস অল্প একটু হেসে বল্‌ল—দেতো মা আঁষবটিটা, বানিয়ে দিই··· ।

—থাক বাবা, আমি বানিয়ে নেবো—বলেই মিলন মাছটা টেনে দাওয়ার একধারে ফেলে দিয়ে বাঁহাতে ঘটি তুলে জল ঢালতে লাগলো সুদাসের হাতে । নিজের হাতে কচ্‌লে কচ্‌লে ধুয়ে দিতে লাগলো সুদাসের হাতখানা—ধোয়া হলে শুঁকে বললো—আঁষ্‌টে গন্ধ রয়েছে, সরষের তেল মাখিয়ে দিচ্ছি—দাঁড়াও !—মিলন একটুখানি সরষের তেল এনে সুদাসের হাতটায় বুলিয়ে দিল বেশ করে । আঁষ্‌টে গন্ধ আর নাই—, আবার শুঁকে দেখলো ।

—তুমি বড্ড ছেলেমানুষ হচ্ছো বাবা—হাতে করে মাছ কেনো আনলে তুমি !

—তাতে কি হয়েছে রে মা—আমি তো আর বামুনের বিধবা নই ! যা, রান্না কর্ ।

—তার থেকে বেশি বাবা—বামুনের বিধবার থেকেও বেশি তুমি । তুমি কখনো মাছ, ডিম ছোঁওনি !

মিলনের চোখে জল দেখা দিয়েছে। আঁচলটা চাপা দিয়ে আবার বললো—অমন যদি কর বাবা, আমিও তাহলে খাব না মাছ…।

দুহাতে ওকে কোলে জড়িয়ে নিয়ে সুদাস ওর মাথায় হাত বুলুতে লাগল—তুই যে আমার মা, আমার মেয়ে, আমার সর্ব্বধন, তোর কথা মানবো না মা?—মন যে চায়!

—না। নিজের হাতে মাছ ছুঁয়ো না তুমি—বলে মিলন রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। সুদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো—গোবিন্দ হে, পার কর,—একটু তামাক দে মা মিলন!

—দিই বাবা—চলো, বসো গে তুমি!—মিলন তাড়াতাড়ি কলকেটায় আগুন চড়িয়ে ফু দিতে দিতে বেরিয়ে এল। মন্দিরের রোয়াকে বসে আছে মাধব। রান্নাঘরের সুমুখের ছোট্ট নাটিকাটি ও দূর থেকে প্রত্যক্ষ করেছে; এদিকে উঠে আসতে ওর কেমন যেন বাধছিল। সুদাস এই বড় ঘরটার দাওয়াতেই বসে পড়েছে একখানা মাদুরে। গোটাদুতিন ধানীলঙ্কার গাছ,—কাঁচাপাকা লঙ্কাগুলো ঊর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে। যেন কোন্ অতৃপ্ত আত্মার জ্বালাকর আঙুল। রাতটা জ্যোৎস্নার—বোধহয় ত্রয়োদশী আজ—বর্ষার মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নায় লঙ্কাগুলো নজরে পড়ছে। সুদাসের কাছেই। হাতদিয়ে ছুঁলো একটা গাছ। লাগিয়েছে ঐ মিলনই। মিলন ঝাল আর টক খেতে খুব ভালবাসে—দাওয়ার নীচেই তাই এগুলো লাগিয়েছে। কী ভীষণ ঝাল—যেন বিষ। এই লঙ্কারই কয়েকটা গাছ সুদাস ঐ সমাধিটার চারপাশে দেবে পুঁতে। বিষের আঙুল জড়িয়ে ওরা সমাধিটিকে ঘিরে থাকবে। কিন্তু কি তাতে ফল হবে! মানুষ অনায়াসে বিষকেও হজম করতে পারে। এমন কি, বিষকে সে সাধ করে খায়—আফিম খায়—কোকেন খায়, কেউ কেউ নাকি কেরোসিন তেলও খায়—খায় শুধু সখ করে। বিষ দিয়ে মানুষকে আটকানো যায় না—মানুষ বিষ নিয়ে কারবার [illegible] বেশি ভালবাসে—নইলে বিষয়-বিষে মজে কেন! আপন-পর ভাবে

কেন! আমার-আমার করে কেন? বৈরাগী সুদাস ঐ তুচ্ছ হাড়কখানার জন্ম এত ভাবছে কেন? কোন্ অমৃত আছে ঐ হাড়গুলোতে? অমৃত নাই, আছে বিষ, সুদাসকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখেছে—নেশা লাগিয়ে দিয়েছে।

—তামাক দিয়েছি বাবা…!

—ও: হ্যা, খাই—যা মা, তুই রান্না কর গিয়ে।

মিলন নিঃশব্দে চলে গেল। সুদাস হুঁকোটা হাতে নিয়ে টান দিল কয়েকটা। মাধব ওখানেই বসে রয়েছে, সুদাস ডাকলো। ডাকা উচিত, নইলে সুদাসকেই গিয়ে ওখানে বসতে হয়।

—মাধব!

—আসছি! মাধব উঠে এল এ ঘরে। মাছটা তখনো দাওয়ার একধারে পড়ে আছে। দেখে সসংকোচে বললো,—দেব বানিয়ে মাছটা? দিই, দাওতো আঁষবটিটা।—কাউকেই দিতে হোল না। ঐ লঙ্কা গাছটার তলাতেই পড়েছিল বঁটিখানা। মাধব কুড়িয়ে নিয়ে এক পাশে বসে গেল মাছ কুটতে। এসব কাজে সে দক্ষ—বরং সুদক্ষ বলা চলে। আঁষ ছাড়িয়ে দিব্যি বানিয়ে দিল মাছটা—জেলেনীদের মতই। হেসে বললো—মাছ না আনলেই হোত মামা—আমি সবরকম খেতে পারি!

—না বাবা, একটা দিন এসেছ। কিইবা আর খাওয়াবো তোমাকে? বৌমা, মাছক'টা ধুয়ে নাও…।

মাধবই কুয়োর কাছের বালতিটার জলে ধুয়ে দিল মাছক'খানা।

রান্নাঘরের দরজার পাশে নামিয়ে দিয়ে আস্তে বললো—এই রইল বৌ, বেরালে না খায়। ঘোমটার ফাঁকে একটা চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিল মিলন। ভ্রমর কালো চোখের তারাটার চার পাশে কালো পক্ষগুলো যেন উড়ন্ত ভ্রমরের মত দেখাচ্ছে। মাধবও দেখলো চোখটা। কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল মিলনের—অকারণ, অহেতুক হাসি—খুবটা

ঘুরিয়ে নিল। মাধব এর মধ্যে সরে এসে বসেছে সুদাসের কাছে, মাদুরটায়। তামাক টানতে টানতে সুদাস বললো,—তীর্থ তো করে এলে খুব। এবার কি করবে? ঘরেই ফিরে যাবে তো?

—না মামা, গৃহবাস আর আমার হোল না। আবার তীর্থেই যাব; যাব একবার নবদ্বীপ!

—তীর্থ যেতে আমি মানা করছি না বাবা, তবে এবার সংসারী হ'। বয়স প্রায় ত্রিশ হোল তোর।

—হুঁ, তা হোল বৈ কি! কিন্তু সংসারে আমার মন নাই মামা—ও থাক্। আমি ভবঘুরে লোক!

—তা বললে কি চলে বাছা। বিয়ে থা' করলেই ভবঘুরেমি ঘুচে যাবে—বুঝলি!

—দেখি। মাধব কথাটা কাটিয়ে দিতে চায়। সুদাসও চুপ করে রইল এবার। যতটুকু কথা ওর বলা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কিছু বলতে চায় না সুদাস। হুঁকোটা ঐখানে ঠেসিয়ে দিয়ে—বেশ জোছনা আজ—বলে তমাল গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘন সবুজ পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় চমৎকার দেখাচ্ছে। ও-পাশে নদীর সাদা বালি—ক্রম-নিম্ন হয়ে চলে গেছে জলস্রোতের কিনারা অবধি। জলটা ইস্পাতের ফলার মত ঝকঝক করছে—কাউকে যেন কেটে খণ্ডখণ্ড করে দেবে। কাকে আর?—সুদাসের এই ভিটিটাকেই! নিশ্বাসটা মুক্ত করলো সুদাস।

হুঁকোটা তুলে নিয়ে মামার আড়ালে মাধব টানতে আরম্ভ করেছে। গল্‌গল্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে। কি একটা জিনিষ নিতে মিলন উঠান পার হয়ে এ ঘরে এল।

—বেশি ঝাল দিও না বৌ—লঙ্কা আমি খেতে পারিনা—মাধব বললো ওর উদ্দেশে। মিলন কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকলো, জিনিষটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—মাধব আবার বলল—টিপটি কৈ! পড়ে গেছে নাকি?

বিতৃষ্ণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিলন তাকিয়ে ফেললো ওর পানে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখখানা—কিছু দেখা যায় না। সবেগে ঘোমটাটা একহাত বাড়িয়ে দিয়ে মিলন ত্বরিতে চলে এল এ ঘরে। এই একটু আগে ওর হাসি পেয়েছিল মাধবের মাছ বানানো দেখে। ব্যাটাছেলে আবার এতও পারে! তার পর ওর সংসারী না হবার ইচ্ছা শুনে করুণা জেগেছিল মিলনের মনে এই কিছুক্ষণ আগে। আর এখনি লোকটা মিলনের টিপ্ হারালো কি না জিজ্ঞাসা করে! আশ্চর্য্য লোক তো! ও আবার সংসারী হবে না? যত সব মিছ্‌মিছেনি কথা! অনেকবার ও সংসারী হয়েছে, অনেকবার। রাধা ঠিকই বলেছে। লোকটা তো ভাল নয় সত্যি! সত্যি ও ভাল লোক নয়। রাগ হচ্ছে মিলনের। বেশ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো মনটা ওর। দেবর নয়, ভাসুর—বারবার মুখের দিকে তাকায় কেন! রাধা বলছিল—'তোর উপর নজর পড়েছে'—ঠিকই বলছিল। মিলনের কুমারী মন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো যেন। ওর মনের পরতে কারো ভালোবাসার আবেদন সাড়া তোলে নি—কোনো রক্তমাংসের পুরুষেরই না। যারা দূর থেকে ওকে দেখেছে, শীষ দিয়েছে, অশ্লীল গান গেয়েছে—তাদের ও অবজ্ঞা করে, অসভ্য বর্বর বলে মনে করে। এই মাধবকেও ও সেই পর্য্যায়েই ফেললো। মাধব একটা অসভ্য, বর্বর—একটা দস্যু!

সজোরে ফোড়ন দিয়ে শব্দ করলো মিলন। ঝালের ঝাঁজটা বাতাসে ছড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। খোন্তা নিয়ে সশব্দে নাড়াচাড়া করে নামালো ঝোল। এর পর ভাত বাড়বে, খেতে দেবে। এ ঘরে এসে আসন পাততে হবে ওকে, কিন্তু লোকটা বসেই আছে। মিলন রান্নাঘর থেকে ডাকলো, —বাবা, এসো খাবে! সুদাস ফিরে এলে তবে এল মিলন এ ঘরে। আসন পেতে সব-কিছু এক সঙ্গে সাজিয়ে দিয়ে দিল—ভাত দিল খুব বেশি করে—যেন আর না চায়—আর না যেতে হয় মিলনকে ওখানে। মাধব রান্নার প্রশংসা করলো কয়েকবার। বহুদিন এমন খায় নাই—তাও বললো—

জলের গ্লাসটা শেষ করে বললো—জল চাই আরেকটু—। কিসের মিলন কি করবে ভাবছে, সুদাস নিজের জলটা ওকে দিতে বললো। খেতে বসে জল খায় না সুদাস। মিলন যেন বেঁচে গেল। পানও ঠিক করা আছে। হাত ধুয়ে পান নিয়ে মাধব চলে গেল বৈঠকখানায় শুতে। সুদাস বললো, —খেয়ে নাও মা—। নিস্তব্ধ উঠানে নেমে আসতে আসতে মিলন ভাবছে, একবারও তো সে বেরুল না—কেন? বেরুলে কী ক্ষতি হোত! আর একবার নাহয় মাধব দেখতো তার মুখখানা—দেখতো! কি তাতে বয়ে যেতো মিলনের?—না বেরিয়ে বোকামী করলো কেন! এঁটো পেড়ে মিলন নিজে খেয়ে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করলো। সুদাস শুয়েছে—জেগে আছে। মিলনও শোবে এবার—মুখের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখলো, টিপটা নাই—রান্নাঘর খুলে পরলো গিয়ে।

* * * *

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মাধব, অতঃপর কি সে করবে। এখানে দিন কতক থাকবে বলেই সে এসেছিল, কিন্তু সুদাস চায় না যে মাধব থাকুক। তাই এবেলা মাছ এনে ঘটা করে খাইয়ে বলেও দিয়েছে, মাধবের এখানে থাকা উচিৎ নয়; যা বলেছে, তার অর্থটা ঐরকমই.. দাঁড়ায়। কিন্তু যাবে কোথায় মাধব এখন!

কীর্ত্তনের দলের কথা মনে পড়ল···শৈলীর কথা, তার সঙ্গে অধিকারী, কুসুম, রেণুর কথাও। শৈলী সুন্দরী···থাকুড়-থুকুড় মাকারি সাইজের— মেয়ে···গায়ের মাংস দলমল করে ··চোখদুটো গোল গোল···হাঁ, সুন্দরই সে। গায়ের রং মিলনের মত না হলেও বেশ ফর্সা। কিন্তু কুসুম লম্বা, দোহারা, শ্যামলা—চোখ দুটি বেশ বড়; রেণু বড্ড মোটা···ওকে সবাই মুটকী বলে। বেশ কিন্তু ছিল মাধব ওখানে। ছিল তো বেশ···গোল বাধালো ঐ শৈলীই। কয়েক মাস যাবৎ তার উদরদেশ ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছিল; অধিকারী শুধুলো—কে?

—[illegible]—শৈলী একটুও ইতস্ততঃ না করে বলে দিল। কেউ প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু মাধব জানে, বরং শ্রীমহাপ্রভু জানেন···মাধব ইয়ারকী করেছে শৈলীর সঙ্গে অনেক, কিন্তু দেহসান্নিধ্যে নয়, শুধু মুখে। শৈলী কিনা—উঃ!—মাধব আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে উত্তেজনায় জোরে টানতে লাগল;

অধিকারী হুকুম করলো···শৈলীকে বিয়ে করতে হবে তোমায়···বুঝলে মাধব?···এদের সবাইকে ভদ্র কন্যা বলে প্রচার করা হয়; বিয়ে না করলে লোকের কাছে জবাব দেব কি করে আমি!

প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল মাধব, সে কিছু অন্যায় করেঁনি··· কিন্তু শোনে কে! হেসেই উড়িয়ে দিল সবাই তার কথা। শৈলী আবার রং চড়িয়ে বলে দিল—তখন তো বেশ হাসিহাসি, আখুন আবার পালাও কেন গো কেষ্টঠাকুর!—ব্যস, আর যায় কোথায়; দলের সবাই ধরে বেঁধে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশে তারিখে ঐ ধোপার মেয়ে শৈলীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাসানুদাস মহাজন-পদ-পূজক ৺গোবিন্দদাসের পুত্র মাধবদাসের বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ে হোল,··রাত্রে বাসর; হারামজাদী শেষ রাত্রে বলে কি—'কেমন মজা হোল মাধব দা' কত দিন, কত করে ইসারা করেছি, সাড়াই দিলে না, শুধু মুখে ফক্কুড়ি করতে··দেখ এখন, মেয়ে জাতকে চিনলে তো এবার?

উঃ! রাগে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করে উঠেছিল মাধবের। সটান দাঁড়িয়ে সে একটা প্রচণ্ড লাথি মেরে দিয়েছিল শৈলীর পেটে···'গাক' করে শব্দ করেই শৈলী অজ্ঞান হয়ে যায়। এল ডাক্তার, এলো এম্বুলেন্স,···হাসপাতালে নিতে হোল শৈলীকে। কুসুম চুপিচুপি এসে বললো···পালিয়ে যাও মাধবদা, শৈলদি বাঁচবে না...রক্ত বন্ধ হচ্ছে না!

ঝোলাটা আর ঝুড়িটা নিয়েই মাধব পথে বেরিয়েছিল, হয়তো তখন পুলিশ আসছিল ওকে ধরতে। ছুট ছুট! ওঃ, কী ভীষণ জোরেই

না ছুটেছিল মাধব সেদিন! কনখাল্ ছেড়ে, ঝোপ ঝাড় পার হয়ে দিগদিগন্তের পানে ছুটেছিল মাধব; কাঁধের ঝোলা আর হাতের ঘুড়িটাও তার মনে হচ্ছিল তখন। বাই-ক্রোক-করে সে পালাতে পেরেছে; কিন্তু পুলিশ তাকে এখনো খুঁজছে; তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তাহলে শৈলী নিশ্চয় মরেছে, নইলে পুলিশ তার পিছু নেবে কেন! ঐ একটা লাথি খেয়েই মরে গেল মেয়েটা··· আশ্চর্য্য? না, আশ্চর্য্য কি আর এমন? লাথিটা ঠিক তলপেটেই পড়েছিল··· আর সময়টাও তখন ওর খারাপ। মরেছে,···ওর মরণের জন্য দুঃখ নাই মাধবের, কিন্তু মাধব এখন খুনের দায় থেকে বাঁচবে কি করে! কুসুম সাবধান করে না দিলে সেইদিনই ধরা পড়তো মাধব। কুসুম খুব উপকারটা করলো কিন্তু! ওর গোয়ালের আদমি বাসুদেবকে দিয়ে দুখানা আলখেল্লা, একতারাটা আর পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল··· নইলে মাধব যে কি করতো! অথচ আশ্চর্য্যের কথা, কুসুমকে কোনোদিন্ মাধব ভালো চোখে দেখেনি। কুসুম বান্দীর মেয়ে, কিন্তু প্রাণ আছে মেয়েটার। আবার যদি কখনো দেখা হয়, যদি এই বিপদ থেকে রক্ষা পায় তো কুসুমের ঋণ শোধ করবে মাধব। কুসুমও মাধবকে কত ইঙ্গিত-ইসারা করেছে, কত ভালবাসার কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু মাধব তখন শৈলীর স্বপ্ন দেখতো, অথচ শৈলীকে গ্রহণ করবার মত দুঃসাহস তার ছিল না। এমন কি, শৈলীর সঙ্গে একটু দৈহিক সঙ্গ করবার দুঃসাহসও না। অথচ শৈলীর মত আর কাউকে ভাল লাগতো না মাধবের। এমন একটা চিত্তদৌর্ব্বল্যের কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এটা ছিল মাধবের। সত্যি, শৈলী কত রকমের কত ইঙ্গিত দিয়েছে··· দলের অন্য মেয়েদের কেচ্ছার কথা বলেছে··· কত অশ্লীল কথা পর্য্যন্ত বলেছে শৈলী···আবার বলেছে···তোমার কাছেই এসব বলা যায় মাধবদা··· আর কাউরি কাছে কি আর মন খোলা যায়!···

··· মাধব ভাবতো, শৈলী তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসে; ধোপার মেয়ে না

হলে···হয় তো···কিন্তু বিয়ে তো ওরা করে না! শৈলী নাচারে পড়ে করতে চেয়েছিলে। আর···আর বোধহয় ঐ অধিকারী-শয়তানই সেই কাণ্ডের মূল। সে-ই শৈলীকে ওকথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল···না হলে সে-ই তো বিপদে পড়তো। শিখিয়েই দিয়েছিল অধিকারী···নইলে শৈলী কখনো বলতো না মাধবের নাম। শৈলীর উপর থেকে রাগটা সরে অধিকারীর উপর যাচ্ছে···আহা! মরে গেল শৈলী···পরের শিখুনিতে প্রাণটা হারালো। কিন্তু শিখলো কেন? ও তো এমন কিছু ছেলে-মানুষ ছিল না! বললো কেন এমন একটা মিথ্যা কথা। কেন বললো? বলতে বাধ্য করেছিল ঐ অধিকারীই। শৈলী মরেছে, কিন্তু অধিকারীকে পস্তাতেই হবে। মাধবের মত গুণী লোক পাবে কোথায় অধিকারী? দল ওর ভেঙে যাবে নিশ্চয়ই।

এই বিপদটা থেকে রক্ষা পেলে মাধব নিজেই একটা দল গড়বে। গড়বে ঐ কুঞ্জ, রেণু ইত্যাদিকে নিয়েই। বেশ লাভ, দু'পয়সা আছে বুদ্ধি করে চালাতে পারলে—আর ফূর্তিও এন্তার—কিন্তু রক্ষা সে পাবে কি করে? খুনের আসামীর রক্ষা পাওয়া অত সহজ নয়। দলের লোকের সঙ্গে বহুবার তার ফটো তোলা হয়েছে; ব্লক করে কাগজে তার ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন দিয়েছে অধিকারী কতবার। তখন ভাবতো মাধব—সে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে উঠলো। আজ সেই বিশ্ববিখ্যাত হওয়াটা তাকে আরো বেশি বিপন্ন করে তুলেছে। লুকুবে কোথায় মাধব? যেখানে যাবে, পুলিশ ওকে ছাড়বে না। দল থেকে পালিয়ে কত দেশবিদেশ ঘুরে মাধব নিজের গাঁয়ে গিয়েছিল গভীর রাত্রে—যাবামাত্রই বৌদি বললে—'সকালের আগেই পালাও, পুলিশে তোমার খোঁজ করছে'। সকাল হবার আর অপেক্ষা করেনি মাধব, তৎক্ষণাৎ পালিয়েছে। কিন্তু যাবে কোথায়! কত দিন এমন করে ঘুরে বেড়াতে পারা যায়? বিরক্ত হয়ে দু'একবার ভেবেছে মাধব—নিজেই গিয়ে সে ধরা দেবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে

ঝুলায় নি ! অনিচ্ছাকৃত, অতর্কিত একটা আঘাতে একজন খুন হোক, কিন্তু অপরাধীর অনিচ্ছার কথা আদালত বুঝবে না—শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ফাঁসী !

মাধব কেমন যেন শিউরে উঠলো—উঠে বসলো বিছানায়—যেন এখনি তাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাতে নিয়ে যাবে—হুকুম বেরিয়ে গেছে। চার পাঁচ মিনিট মাধব নিঃশব্দে বসে রইল অন্ধকারে। তারপর বিড়ি দেশলাই বার করে জ্বালালো—না, এখনো তাকে ধরতে পারে নি পুলিশ। এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসামীকে ধরা অত সহজ নয়। এখানে মাধব যে এসেছে, একথা কেউ জানে না, জানবে না। মাধব বেরুবে না ঘর থেকে। কিন্তু এখানে থাকতেই দেবে না যে সুদাস—দেবে—মাধব যাবে না—, সুদাস অপমান করলেও যাবে না—দিনকতক বিশ্রামের ওর বড্ড দরকার !

ওঃ ! কী বিট্‌কেল আওয়াজ ! প্যাঁচা ডাকছে নাকি ! প্যাঁচাই হবে। বালিশটায় ঠেশ দিয়ে মাধব বিড়ি টানতে লাগলো। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলো, মন্দিরের মধ্যে থেকে আলোর ছটা বেরুচ্ছে—সন্ধ্যার জ্বালা প্রদীপটা এখনো জ্বলছে নাকি ? আশ্চর্য তো ! কিম্বা হয়তো বিজন রয়েছে ওখানে। কি করছে ওখানে ও এতরাত অবধি—কি জানে, হয়তো শুধু প্রদীপটাই।

নাঃ—এবার ঘুমুতে হবে। ঘুমুতে পারবে নির্ভয়েই। এখানে, এই অজ পাড়াগাঁর জঙ্গলে কেউ মাধবের খোঁজ পাবে না—নিশ্চিন্তে ঘুমুবে মাধব। বিড়িটা ফেলে দিয়ে শুলো।

ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না ঢুকেছে—চাঁদটা ঠিক মুখের উপর—অস্বস্তি লাগছে মাধবের; ঘুমের চোখে চাঁদ ভালো লাগেনা, ও কাব্যেই ভালো। চাঁদের আলোতে বসে শৈলীর সঙ্গে কত গল্প করেছে, কাব্য গান গেয়েছে। একদিন, সে বোধ হয় কোন পূর্ণিমার দিন—শৈলীর তখনো জানাজানি

হয় নি—কীর্তন গেয়ে এসে বসেছিল একটা যায়গায়—পুরীর সমুদ্রের কিনারে—শৈলী আর মাধব।

—আজকার পালাটায় কিছু রস ছিল না মাধব দা—শৈলী বলেছিল। অধিকারীর লেখা পালাতে রগড় কিছু থাকে না—খালি খালি লম্বা লম্বা কথা—উ'সব কি গান মাধবদা—"বরিহাবিরচিত চির চিতচোর চূড়া শিরে—" মানে কি উ'কথার?

—মানে আছে বৈকি? অনুপ্রাস আছে। তুমি বুঝবে কি করে? মাধব উত্তরে বলেছিল।

—ছাই আছে না পাঁশ আছে! দোলের রংদার গান—দুটো রসের কথা থাকবে, দুটো মজাদার ঢং থাকবে—তা না—বরিহা না বঁড়শী কি সব ছাই···!

বঁড়শীই বটে। জলের মাছ গেঁথে ডাঙ্গায় তুলতে ঐ রকম গানই দরকার, কেউ বোঝে না টোপ ফেললো না খাবার দিল; কিন্তু মাধব জবাব দিয়েছিল অন্যরকম। বলেছিল—

—লিখতে জানলে তো লিখবে পালাগান। ওসব নীলকণ্ঠ, গৌরদাস, কামলোচনের পদ থেকে চুরি করা—ঐ যে জয়দেবের আছে না—"ঘনজঘন মণ্ডলে"—অধিকারী ঐটেকে ভেঙে করেছে কিনা—ঘন মানে মেঘ, ঘনজ, মানে মেঘে যার জন্ম, অতএব জল, সবটার মানে ঘোলাটে জলমণ্ডল, তারপর অনুপ্রাস দিয়েছে 'জলের মণ্ডলে মণ্ডিত মাধুরী মাধব হেরই হা-সি'··· কচু! মানেই বোঝে না শালা চাষার! লেখাপড়া তো কোঅলায় না হয় কথামালা অবধি!

হেসে লুটোপুটি খেতেখেতে শৈলী শুধিয়ে ছিল—তা হলে মানেটা কি উ'কথার মাধব দা? অতঃপর গোটা কবিতাটার মানে করতে হয়েছিল মাধবকে—সাধুভাষায় মানে করতে দেয় নি শৈলী—সহজ ভাষায় মাধব যা বলেছিল, শৈলী অশ্লীল খেউড় বলে তার বিশদ টীকা করেছিল তৎক্ষণাৎ।

জয়দেবকে সেদিন কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল ওরা সাগরতীরের সেই বালিয়াড়ীতে !

—আচ্ছা রসের গান তো !—শৈলী শেষটায় বলেছিল—তা তুমিও তো এমনি লিখতে পার মাধবদা—লিখো না কেনো ! লিখো—তুমাতে আমাতে আরেকটা দল করবো—পারবে না লিখতে ?

শৈলীর মতন মেয়ে বদলে পারবে না—এমন কোন্ কাজ আছে নাকি ? যে কোনো পুরুষই যে-কোনো কাজ করতে পারে যদি মনের মতন মেয়ের কাছ থেকে প্রেরণা পায়। যৌবনে মানুষ সেটা বহু নারীর কাছ থেকে পায় বলেই তো যৌবন এত শক্তিশালী—এমন দুঃসাহসী ! শৈলী প্রেরণা যুগিয়েছে মাধবকে ! প্রেরণা যুগিয়েছে পালাগান লিখতে—সোজা ভাষায় সহজ করে লিখতে—আর রসের ভাবগুলো ঐ শৈলীই যুগিয়ে দিয়েছে। সারারাত জেগে মাধব লিখতো, সকালেই শৈলী শুধুতো—'কৈ, শোনাও ; না, ঠিক্ হোল না, আরো কাঁচা কথা লিখে দাও—লিখো যে'···কানে কানে কথাগুলো বলে দিত মাধবের। তারপর বলতো,—এইগুলোনই একটুন্ ভালো কথায় লিখে দাও গো—বুঝলে কিনা, শুনে সবাই রস পাবে !

শেষটায় মাধব কৃতকার্য্য হয়েছিল শৈলীকে খুসী করতে। বিদ্যাসুন্দর, গোপাল উড়ে ইত্যাদির টপ্পাগুলো ওকে সাহায্য করেছিল এবিষয়ে, আর সাহায্য করেছিল শৈলী স্বয়ং। কত নতুন নতুন কথা যে সে বলতে পারতো ! মাধব হয়তো লিখলো—

—"পূরব গগনে চাঁদ—

রাধার আঁচলে পড়েছে জোছনা, কানু ধরিবার ফাঁদ !"

শৈলী এসে বদলে দিত—'কানু একলা কেন ধরা পড়বে ? আমরা সবাই রাধা, তোমরা সবাই কানু। লিখো—"পীরিতি রসের ফাঁদ।" লেখাটা কেটে তাই লিখতো মাধব, শৈলী বলতো 'আঁচলেটা' 'অঙ্গে' করে দাও—মাধব তাই করতো ; পড়ে শোনাতো,

পূরব গগনে চাঁদ—

রাধার অঙ্গে পড়েছে জ্যোছনা, পীরিতি রসের ফাঁদ।

—হুঁ, এতক্ষণে হোল। ইসব পীরিতি-টিরিতি না থাকলে কি পালা জমে মাধবদা!—বলতো শৈলী। আহা, মরে গেল—বেশ ছিল কিন্তু মেয়েটা!

একটা লাথিতেই মরে গেল অমন যোয়ান শক্ত-সমর্থা মেয়েটা! আহা! মাধবের সঙ্গে গেলেই হোত—ঘরে নিয়ে এসে অনায়াসেই বলতে পারতো, বিয়ে করে এনেছে—কিন্তু ওর ছেলেটা? নাঃ—মরে ভালই করেছে। কার না-কার ছেলে—মাধব তাকে নিজের ছেলে বলে নিতে পারবে না—কিছুতেই না! মরেছে, মাধব মেরেছে তাকে—যদি পুলিশের হাতে রেহাই পায় তো মেয়ে-জাতকে আর বিশ্বাস করবে না—বিয়েও করবেনা। কিন্তু মেয়ে-জাতটাকে ওর যেন কেমন অদ্ভুত ভালো লাগে। ওদের চলন-বলন, হাসিকান্না, ওদের গালাগালি পর্যন্ত ভালো লাগে মাধবের। অথচ তাদের নিবিড় সান্নিধ্য ও এত সুযোগ সত্ত্বেও এড়িয়ে এসেছে। অদ্ভুত বোকামি! শৈলী প্রতিশোধ নিল তার নির্বুদ্ধিতার, নির্মম প্রতিশোধ। মরেও ছেড়ে কথা কইছে না, পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।

পালাগানটা যখন শেষ হব-হব—তখন একদিন শৈলী বলেছিল,

—ই গান যে শুনবে মাধব দা, সে সারারাত সেদিন তার রাধাকে নিয়ে জেগে থাকবে।

—তার রাধা যদি না থাকে?

—যোগাড় করে নিবে। সবাই কি আর তুমার মতন ভীতু—না, রাধার অভাব আছে দিরখিদিতে?

ঠিক কথা—মাধবের মত ভীতু লোক আর আছে কিনা সন্দেহ! বাজারের একটা মেয়ের গায়ে মাধব হাত দিতে পারে নি কোনোদিন; অথচ বেশ জানতো—শৈলী কিছু বলবে না—কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু

যদি বলে—যদি কেউ দেখে—যদি শৈলীই চটে যায়—উঃ! এতখানা বোকামী কেউ করে? ঐ দিনই শৈলী শুধিয়েছিল—নাম দাও—কি নাম দিবে পালটার?

—দিয়েছি—বাসকসজ্জা!

—ধেৎ! তুমার মাথা! নাম দাও "বাসর-বিলাস" না-হয় 'বাসর শয়ন,' নয়তো, 'বাসর ঘর'!

—আচ্ছা—বাসর বিলাসই থাক!

— বেশ, কিন্তু সব বইটার কি নাম দিবে? ঠিক করেছ কিছু!

—হুঁ, 'শ্রীরাধামাধুরী'।

—তুমার মুণ্ডু! শ্রীরাধা-মাধব কল্লেই ঠিক হোত! মাধুরী কেনে আবার? উ নামের বই কেউ কিনবে না। নাঃ, তুমি কিছু শিখলে না মাধবদা—সেই তেমনি বোকাবোকাই থাকলে। এতো লিখাপড়া শিখেছ! আহাম্মক কোথাকার! নাম দাও এমন যে কেউ বুঝবে না, ঐ বল্লিহা না বঁড়শী কি যেন ছাই, সেই রকম শুনতে যেন কুচ্ছিৎ হয়, আর মানেটো হয় বেশ ভালো, যেমন ধর "ঘনজঘনমণ্ডল"···না হয় তো 'কুচকুম্ভ' না কী, ঐ রকম। মানে কি জানো! খোলাখুলি করে নাম দিলে বে-আব্রু হয়ে যায়, এই যেমন আমি শাড়ীটো একবার অগোছালো করে আলু থালু করি, আবার গুছিয়ে নিই। সব সময় অগোছালো রাখলে তোমার বিরক্ত লাগতো।

বলতে বলতে হাসতো—হেসে আঁচলটা সত্যি খানিক টেনে বলতো আবার—এমনি করে যদি হেঁটে হেঁটে যাই তো ভাববে, ছুঁড়িটা বড্ড অসভ্য;—কিন্তু এমনি—আঁচলটা ঢেকে দিত—সত্যি মাধবদা, আব্রুর বুড্ড দরকার আমাদের—এই মানুষ-মেয়েদের। পাখীর দেখ, পালকের পর্দা আছে, গরু-ছাগল ভেঁড়ার রোঁয়া; সব জন্তুরই আছে কিছু না-কিছু আব্রু, শুধু মানুষের বেলা কিছু নাই। এই যে দেখছো বারোহাত লম্বা

শাড়ী—পুরুষরা কখনো এর ছিষ্টি করে নাই, করেছে মেয়েতে। আবরু না থাকলে মেয়েমানুষের দাম নাই পুরুষের চোখে!

কথাটা নিদারুণ সত্যি। সারাটা দিন আজ এই সত্যটা উপলব্ধি করেছে মাধব। কত চেষ্টাই না করেছে সে মিলনের মুখখানা দেখবার জন্ম! আশ্চর্য্য! একটু আঁচলও সরে না ওর পিঠ থেকে! পায়ের আর হাতের মুঠি আর একখানা মাত্র চোখ শুধু দেখেছে মাধব। অদ্ভুত সাবধানী মেয়ে মিলন। শৈলী আর মিলন—ওঃ কত তফাৎ! কত বিশ্বব্যাপী ফারাক দুজনায়! অথচ মিলনও তো মেয়ে; শৈলীর মতই কামনা-বাসনায় পঙ্কিল মেয়ে। কে জানে! হয়তো মিলন আরেক ধরণের মেয়ে—তাপসী শ্রেণীর মেয়ে—দেবীর জাতের মেয়ে!

মাধব মন্দিরটার দিকে তাকালো। দরজা বন্ধ রয়েছে। ভেতরে কেউ আছে কি না জানা যায় না। মিলন এতক্ষণ শুয়েছে, ঘুমিয়েছে বোধ হয়। রাত তো কাবার হয়ে এল। মাধবও এবার ঘুমিয়ে নেবে একটু। এই বিড়িটা শেষ করেই ঘুমিয়ে পড়বে। জোরে টান দিল বিড়িতে। মনে পড়ল, ঝোলাটা ও-দিকের বারান্দায় ছিল—মিলন ঘরে রেখেছে নিশ্চয়। ওতে সেই বইটা আছে। মিলন যদি পড়ে! নাঃ, ওর পড়ে কাজ নাই। কত কি লেখা আছে। মিলন যেন না পড়ে। কাল সকালেই বইখানা আর ঝোলাটা এই ঘরে নিয়ে আসবে মাধব। পালাগান তো আর করা হবে না, বইখানা লিখে শেষ করে রাখবে।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে মাধব শুলো—একটু জল খেতে পারলে ভাল হোত, কিন্তু সবাই ঘুমুচ্ছে।

ওঘর থেকে বেরিয়ে মিলন এঘরের বারান্দায় এসে উঠলো। সারাদিনের ক্লান্তি। ক্লান্ত খুব বেশি হয় নি সে—তবে উনুনের আঁচে আর গরমে

সারা গা'টা ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। সর্বাঙ্গ একবার মুছে না নিলে ঘুমুতে পারবে না। বারান্দার থাম থেকে গামছাটা নিতে গিয়ে মিলন দেখলো—মাধবের ঝোলাটা ঝুলছে একটা পেরেকে। কী আছে ঝোলাটার মধ্যে ? নারী-জনোচিত কৌতূহল ওকে পেয়ে বসলো যেন। উঁকি দিয়ে দেখলো—শ্বশুর শুয়ে পড়েছে তার নির্দিষ্ট ঘরে। ওদিকে বৈঠকখানায় অতিথিও শুয়েছে। মিলন শোয় কুয়োতালার দিকের অন্য একটা কুঠরীতে,—সেই কুঠরীর পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি। তিন লণ্ঠনটা ঐ বারান্দার এক কোণে কমানো-আলোয় জ্বলছিল। মিলন গামছাটা কাঁধে ফেলে ঝোলাটা হাতে নিয়ে লণ্ঠনটাও তুলে নিল—ঘরে ঢুকলো। আলোটা উস্কে দিয়ে ঝোলাটা দেখতে লাগলো—গোটা কয়েক মালা, রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, পলা ইত্যাদির মালা, একটুকরো গঙ্গামাটি—লাগে বোধহয় তিলক কাটতে। ভাঁজকরা একখানা আলখেল্লা গেরুয়া রংএ ছোপানো—কিন্তু ভেতরে কি যেন শক্তমত—মিলন বার করে খুলে ফেলল ভাঁজ—একটা ভালো আয়না—ছোট্ট কিন্তু জিনিষটি ভাল। একটা চিরুণীও—হয়তো লম্বা চাচরচুল আঁচড়াতে হয়, চুড়ো বাঁধতে হয়, তিলক কাটতে হয়, তাই আয়না রেখেছে। আয়নাটা তুলে নিজের মুখখানা একবার দেখলো মিলন ;—বেশ দেখা যায়। জিনিষটা দামী—মিলনের মুখখানায় ঠিকঠিক ছায়া পড়েছে ; টিপটা জ্বল জ্বল করছে জোনাকী পোকার মত। ভুরুনীর নীচে একটু কালি লেগে রয়েছে—মিলন গামছাটা রগড়ে মুছে দিল কালিটুকু ; টিপ্‌টা ভালো করে বসিয়ে নিল কপালে।

কিন্তু আর কি আছে ঝোলার মধ্যে ! সব শেষে কয়েকখান পুঁথী—গীত গোবিন্দ—পদকল্পতরু,—বিদ্যাপতি, বিদ্যাসুন্দর, গোপাল উড়ের গান, আর একখানা খাতা। বাঁধানো খাতাটার প্রায় তিনভাগ গোটাগোটা অক্ষরে কি সব লেখা রয়েছে—গান—দুএকটা বক্তৃতাও, কীর্ত্তনের আখর, তাল, খোলের বোল !

সেই গানটাও আছে নাকি এর মধ্যে ? সেই যে গাইছিল—'আড়াল দিয়ে লুকিয়ে ?' মিলন খাতাখানা একবার দ্রুত হাতে উল্টে গেল। অনেকগুলো পাতা, প্রায় দুশো—চট্‌করে দেখা সম্ভব নয়। এ ঘরে বেশিক্ষণ আলো জেলে রাখলে ও ঘর থেকে শ্বশুরের চোখে পড়বে। তার চেয়ে ঠাকুরঘরে গেলে বেশ হয়। খাতাখানায় কি লেখা আছে, মিলন দেখে নিতে পারে ওখানে। ঠাকুরঘরে বহুরাত্রি পর্যন্ত মিলন থাকে, শ্বশুর জানে। পড়ে মিলন ওখানে বসে বসে। বই ক'খানার মধ্যে শুধু খাতাটা আর বিদ্যাসুন্দরখানা বার করে মিলন আর সবকিছু ঝোলাতেই রেখে দিল—ঝোলাটা আবার ঝুলিয়ে দিল সেই পেরেকে। বিদ্যাসুন্দর ওর নাই। কিন্তু নাম শুনেছে বইখানার—পড়বার ইচ্ছা আছে। বাকি যা সে-সব মিলনের নিজেরই রয়েছে। বই চুরি করছে না মিলন—পড়ে আবার ঐ ঝোলাতেই রেখে দেবে। বালিশের তলায় বিদ্যাসুন্দর খানা রেখে মিলন আলো নিয়ে বাইরে এল। বগলে সেই খাতাখানা আর কাঁধে গামছা।

শ্বশুর ঘুমুচ্ছে। আস্তে উঠোন পার হয়ে মিলন মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো। মন্দিরে মহাপ্রভু আসীন—তাঁর কাছে মিলন নিশ্চিন্তই থাকে, ভয়ডর কিছু লাগে না ওখানে ওর। নিশ্চিন্ত হয়ে পিঠের আঁচলখানা সরিয়ে সেমিজ আলগা করে গা-হাত-পা মুছলো মিলন! দরজা খোলা থাকলে এখানে প্রচুর হাওয়া আসে নদী থেকে। ছোট জানালাও একটা আছে। দরজা বন্ধ করবার দরকারইবা কি! সবাই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু কি যেন শব্দ হোল—উঁকি দিয়ে দেখলো, মাধব বিড়ি ধরাচ্ছে।

উঠে আসবে না তো আবার ? কি-জানি—মিলন মন্দিরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। এখন সে নিরাপদ। ছোট জানালটা দক্ষিণ দিকে, তমালগাছটার দিকে। ওদিক থেকে কেউ দেখতে আসতে পারে না। নিশ্চিন্ত হোল মিলন। জানালা পথে প্রচুর হাওয়া আসছে না, কারণ হাওয়ার নির্গমনের পথ নাই—গরম হবে একটু—হোক।

শাড়ীটা একেবারে কোমরের কাছে তুলে মিলন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লো মেঝেতে ; খুব ঠাণ্ডা মেঝে···গা' যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। পাথরের মেঝে, ধোয়া হয় দুবেলা, ঠাণ্ডা তো হবেই। আলোটা একটু তফাতে রেখে মিলন দেবমূর্তির পানে চাইল। নিজকে দেবদাসী বলেই মনে হচ্ছে ওর···। প্রিয়তমের কাছেই যেন শুতে এসেছে ও! উঁচু পোঁপাটাই বালিশের কাজ করছে, কিন্তু ঘাড় আরেকটু উঁচু হলে পড়বার সুবিধা হয়। শাড়ীর আঁচলটার অনেকখানা গুটিয়ে এনে মিলন ঘাড়ে গুঁজে দিল। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট এবার ও। আরেকবার চাইল মূর্তির পানে। মিটকি-মিটকি হাসছেন ঠাকুর কাণ্ড দেখে। কী ভাবছেন? নির্লজ্জ ভাবছেন? তা স্বামীর কাছে শুতে এসে কে না একটুখানি নির্লজ্জ হয়? হয় সবাই···; ঠাকুরের দিকে চেয়েই হাসলো মিলন একটু।

খাতাখান তুলে নিল বুকে···পাতা উল্টেই দেখলো, লেখা আছে :···

শ্রীরাধা-রসায়ন

লেখক···শ্রীমাধবদাস দাসবৈষ্ণব··· কবিকঙ্কণ, সরস্বতী।

ওঃ! উনি আবার বই লেখেন নাকি? এতো গুণ! আবার কবিকঙ্কণ, তা'বই সরস্বতী! আপনার মনেই বললো মিলন কথাগুলো। ও খুঁজতে চায় সেই গানটা। সেই "আড়াল দিয়ে" গানটা তাহলে এরই লেখা; ···নিশ্চয় এই খাতায় টোকা আছে···কোথায় আছে, খুঁজবে, কিম্বা, গোটা বইটাই পড়ে যাবে! পড়েই যাওয়া যাক···দেখা যাক না কি লিখেছে!

মিলন প্রথম থেকেই পড়তে আরম্ভ করলো। বেশ দুর্বোধ্য লাগছে, যেন সামঞ্জস্য নেই। ছন্দ ভুল, অলঙ্কার ভুল, ভাষাও মার্জিত নয়···তবু পড়ছে মিলন। ধেৎ! এতো ভুল আবার কেউ লেখে নাকি! বাপ্পা! আদি রস না ছাই হয়েছে! কিন্তু কথাগুলো বেশ···বেশ বসিয়েছে কথাগুলো; সোজা সরল একেবারে, গ্রাম্যতা আছে বিস্তর···অতিশয়োক্তির চূড়ান্ত···আর অশ্লীল। কিছু রাখাঢাকা নাই···খোলাখুলি অশ্লীল।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদি পড়েছে মিলন। অশ্লীলতাও সেখানে যেন কবিত্বের আবরণে মণ্ডিত, এ কিন্তু না-কবিত্ব, না-ভাবুকতা। বিদ্যাপতির সেই যে আছে…"মাজি ধরল জনু কনক কটোরা…মানে সোনার বাটিটি মেজে ধরলো"…এখানে কিন্তু সোনার বাটি বলেন নি…একেবারে খোলা-খুলি "কুচযুগ" লিখেছেন ; তা কিইবা এমন মন্দ! জয়দেব তো লিখেছেন…"স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরিমণি-মঞ্জরী"—বৈষ্ণব কবিরা লেখেন ওরকম। শ্রীরাধার রূপ…পার্থিব রূপ নয়…মহাভাবরূপ! মূর্তিমতী প্রেম তিনি…চণ্ডীদাস বলেছেন 'কামগন্ধ নাহি তায়'…কিন্তু, ইনি যেন অশ্লীলতা করবার জন্যই কলম ধরেছেন…এই মাধব দাস! দূর দূর…এই কি ঠাকুর দেবতার পদ হয়েছে! লজ্জাও করে না!

খাতাটা একপাশে রেখে মিলন উবুড় হয়ে শুলো—অশ্লীলতা! গ্রাম্যতা, ছন্দোজ্ঞানের অক্ষমতা—বিরক্তিকর একেবারে! মাঝে মাঝে আবার একটা কাঁচা হাতের লেখা রয়েছে—পেনসিলের লেখা, সেগুলো আরো অশ্লীল। অন্য কেউ লিখে দিয়েছে বোধ হয়। মেয়েলী হাতের লেখা! কোনো মেয়ে ওসব কথা কি লিখতে পারে? অসম্ভব! কোনো ব্যাটাছেলেই লিখেছে! বিচ্ছিরি!

চোখবুজে খানিক পড়ে থাকলো মিলন। ঘুম আসছে না…গরমও লাগছে! উঠে দাঁড়ালো ; শ্লথ বসনা আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে গিয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে। জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী। তমাল গাছটার পাতাগুলো পান করছে যেন জ্যোৎস্নাকে। তার ঘনকৃষ্ণ ছায়ার আঁধারে আছে নরোত্তম…স্বামী ওর। ওখান থেকে উঠে এসে যদি দাঁড়ায় সামনে!…শিউরে উঠলো মিলন। দূর্! এ ঠাকুরের ঘর। এখানে কার সাধ্যি আসতে পারে! কিন্তু জানালার কাছে দাঁড়াতেও ভরসা হচ্ছে না…তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘর একেবারে বন্ধ…আলোটা জ্বলছে। মিলন মূর্তির সামনে দাঁড়ালো…ঠিক যেন দেবদাসী। নৃত্যভঙ্গীতে

দাঁড়ালো মিলন···সেই ভঙ্গীতে, উপরের ঘরে অজন্তার সেই ছবিটা যে ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির গায়ে আছে গয়না···মিলন নিরাভরণা···; ছবিটার মত নিশ্চয় ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে না···কিম্বা বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে? কে দেখে বলবে ওকে! ওতো দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ঠাকুরই তো দেখছেন। হাসছেন মিটিমিটি। হ্যাঁ···তা হলে ঠাকুরের ভালো লাগছে. মিলন নাচের ভঙ্গীতে দুবার পা' ফেললো! হাতদুটি বাঁকালো··· ঘাড়টা কাত্ করলো—কেমন্ দেখাচ্ছে! দেখাচ্ছে ভালোই, ভালোই দেখায়, কিন্তু কে দেখবে! ঠাকুর? কে জানে দেখছেন কি না·· ঠাকুরের ষোলহাজার গোপী আছে, মিলনকে যেন দেখতে আসবেন? তা হলে আর ভাবনা কি ছিল! কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখেছিলেন, গোপীদের দেখেছিলেন, মীরাবাঈকে দেখেছিলেন ··মিলনকেও তো দেখতে পারেন! দেখবেন বৈ কি!

মিলন আস্তে নাচতে আরম্ভ করলো। বড্ড গরম ··কিন্তু তার খেয়াল হোল যখন ঘামে আপাদমস্তক স্নানকরা হয়ে গেছে। উঃ, বাপ্‌স্ কী গরম! গামছা টেনে নিয়ে গা মুছলো জানালাটা খুলে দিল, দরজাটাও ফাঁক করে দিল একটু! শূন্য উঠোনে জ্যোৎস্না লুটোচ্ছে। নদীর হাওয়ার শির শির শব্দ · দূরের ঝিঁঝির ক্লান্তিহীন আওয়াজ···জোনাকির জলজলে গতিরেখা, সবটা একবার দেখে নিল মিলন। রাত কত কে জানে! বেশ হাওয়াটি আসছে কিন্তু। এইখানেই শুয়ে থাকা যাক।

মেজেতেই আবার শুলো মিলন·· শাড়ীটা টেনে দিল মাথার বালিশের বদলে। ঘুম আসবার কোনো লক্ষণ নাই। মিলন ঐ খাতাখানাই টেনে নিল। পড়ছে—"জ্যোৎস্না উঠেছে, শ্রীরাধা সাজসজ্জা করে বসে আছেন। তাঁর অঙ্গ সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে দুচারটা ভ্রমর উড়ে আসছে, দু'একটা মৌমাছি, একটা শঙ্খচিলও"···দূর্ ছাই! অসঙ্গতি দোষ! শঙ্খচিল তো রাতে ঘুমুয় বাপু! এলেই হোল নাকি যখন তখন! মিলন ভাব্‌ছে আর পড়ছে :—

রাধা রূপ-সরসীতে যুগল কমল ছুটি

(একবার 'যুগল' আবার 'ছুটি'-ধেৎ)

হেরই হেরই চিল ঘুরে…।

(রেতের বেলা চিল…আহা !)

কটিতটে ত্রিবলী তিনটি সোপান যেন

উত্তরিতে কাম সরোবরে…

• (মিল হয়নি·· ধেৎ)

বাঁহাত দিয়ে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মিলন একদিকে। মনের অজান্তে যেন একটা চিন্তা ওর মনকে পেয়ে বসলো…একটা, দুটো, তিনটে…হ্যা, তিনটেই থাকে তো ! "উত্তরিতে কাম সরোবরে"। হুঁ ! কাব্য আছে কথাটায়। কোথাও থেকে ধার করেছে হয়তো। ওর মাথায় আবার এসব গজাবে…আরো কিছু ! পাশ ফিরে শুলো মিলন। আলোর শীষ কমিয়ে দিল…নিবিয়ে দিল একেবারে ! বেশ নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। মাধব দেশলাই জ্বালছে…আলোর ছটা এল উঠানে। ঘুমোয় নি লোকটা এখনো…আশ্চর্য্য ! করছে কি ও এতরাত অবধি ? দুই কবাটের ফাঁকে মুখ রেখে মিলন দেখে নিল একবার…মাধব বসে বসে বিড়ি টানছে ! টানুন সে ! যা অশ্লীল সব লেখে ! রাধারাণীর কথাই ঠিক…লোকটা সুবিধার নয়…ঐ যে "উত্তরিতে কাম সরোবর"…ওর পাশে আবার পেনসিল দিয়ে আরো কুচ্ছিৎ কথা লিখে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। কে সে ? মেয়ে নাকি কেউ ! কেউ হবে ওর ভালোবাসার মানুষ। ও [illegible] বলে, তীর্থ করবে…বিয়ে করবে না। সংসার করবে না…সাধু-মহান্ত হবে ! কচু হবে ! মিলনের দিকে কেমন চোরা চোরা চাইছিল…তা করুক না বাঁলাচন্দন ! বলুক না শ্বশুরকে ! দেখি কেমন বাহাদুর ছেলে ! তা নয়, খালি লুকিয়ে তাকাবার চেষ্টা ! রাধুর কথাই ঠিক…"নজর আছে।"

ফাজিলের কিন্তু একশেষ ঐ রাধুটা ; বাব্বা ! কীসব কথাই না বললো ! বলে, ব্যাটাছেলেকে ও বিশ্বাস করে না। ব্যাটাছেলে না হলে যে চলেই না বাপু ! এইতো দেখছো, ঐ নরুটির অভাবে সংসারটা ছারেখারে যাচ্ছে। পরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতন দেখতে চায় শ্বশুর…হুঁ…তাই-না আবার হয় ! এক গাছের ছাল অন্য গাছে নাকি জোড়া লাগে ! তাহলে আর দুঃখ কি ছিল ! পাঁচ বছর তো চলে গেল।···কিশোরী মিলন যুবতী হয়েছে। · অঙ্গে অঙ্গে উদ্দাম ঢেউ জেগেছে···মিলন নিজের সর্ব্বাঙ্গ দেখতে চাইল কিন্তু অন্ধকার, কিছুই দেখতে পেল না।···বিয়ে দিলে এদ্দিন একগণ্ডা ছেলে হোত মিলনের !

উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মিলন আবার। নদীর হাওয়ায় দরজাটা একটু বেশি ফাঁক হয়ে গেল···বেশ হাওয়াটি লাগছে গায়ে···ফুরফুরে হাওয়া। মিলনের মুক্ত অঙ্গ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ লোকটা যে জেগে আছে···উঠে যদি এদিকে আসে তো দেখতে পাবে মিলনকে। নাঃ, আবার উঠে দাঁড়িয়ে খিল্‌টা লাগিয়ে দিতে হবে। যত্তো ঝামেলা ! ওর কাছে খোলা গা' দেখানো চলে না। কার কাছেই বা চলে ! কারো কাছে না। যতই গরমে প্রাণ বেরুক···বড়ো মেয়েদের সাত পাক কাপড় জড়িয়ে থাকতেই হবে। ব্যাটাছেলেদের বেশ···কৌপিন পরে ঘুমোতে পারে কেমন !

হাওয়ার ঝাঁপটায় দুটো কবাট একেবারে খুলে গেল। জ্যোৎস্নাটা ম্লান হয়ে উঠেছে। উঠোনের নিকানো মাটি ছবির মত দেখাচ্ছে···চেয়ে দেখলো মিলন। কিন্তু ও যদি এদিকে এসে পড়ে···মিলন এভাবে থাকতে পারে না···দরজাটা বন্ধ করে দিতেই হবে ! উঠে বসলো মিলন। সুন্দর হাওয়া···শীতল, ঘুম-পাড়ানো হাওয়া। চোখ দুটো বুজে আসছে মিলনের। কিন্তু এমন করে বসে থাকা আরো অসভ্যতা···আরো বেশি নির্লজ্জতা। কারো চোখেই যেন না পড়ে এ বেশ। কেন ? স্বামীর চোখে পড়লে

কিছু তো ক্ষতি হয় না! সেই একমাত্র লোক যার কাছে যেকোনো রকমে ঘুমানো যায়; যায় কি না কে জানে? মিলন তো তার কাছে শোয় নি কোনো দিন। ওসবের কিছু জানে না মিলন। রাধাকে শুধুবে! কালই শুধুবে। স্বামীর কাছেও গা-ময় কাপড় জড়িয়ে থাকতে হয় কি না। না, বোধ হয়—হয়না। কিন্তু এতখানা নির্লজ্জতা করতে পারে মেয়েরা? সব্ মেয়েই পারে? পারে; স্বামী যে শ্রীকৃষ্ণ! তাঁর কাছে লজ্জা কিসের! গোপীদের বস্ত্রহরণ তো লজ্জাকে জয় করবার জন্যই! বৈষ্ণব কবি তো রাস অধ্যায়ে বলেছেন "স্নিহ্যতি কামপি, চুম্বতি কামপি, কামপি রময়তি রামাম্"। বিদ্যাপতি আরো খোলাখুলি বলে গিয়েছেন। স্বামীর কাছে ঘৃণা-লজ্জা ভয় রাখতে নেই! ঐ লোকটা যদি মিলনের স্বামী হোত, তাহলে···তাহলে কি আর মিলন এখানে পড়ে থাকতো···নাকি দরজা খোলা থাকায় এত অস্থির হোত? ও কেউ নয় মিলনের!

ধেৎ! কি-সব ভাবছে মিলন! তার স্বামী তো এই এখানে। এই যে সুন্দর স্বামী···চিরসুন্দর···চির মধুর। অন্ধকারেও মুখখানি কেমন দেখা-যাচ্ছে,···আহা! ওঁর কাছে তো লজ্জা করে নি মিলনের। উনি সারা রাত দেখছেন, মিলন খোলা গায়ে শুয়ে আছে; দেখছেন আর হাসছেন মিটি-মিটি। শুধুই হাসছেন; ভারি বাহাদুর যেন! একবার হাতদুটি বাড়িয়ে মিলনের গলাটা তো ধরতে পারতেন···মিলনের ঠোঁটের সেই কালো তিলটিতে একটি চুমা···নাঃ। ওঁকে হাসতে [illegible]ওয়া হবে না। মিলন কাপড় ঢাকা দেবে গায়ে। ওঁর দুষ্টুমি সহ্য হচ্ছে না মিলনের!

উঠে মিলন পুঁটুলিকরা কাপড়টা ঝেড়ে ঠিক করছে, কে যেন সদরের দরজায় ঘা-দিল। কে? কে ডাকে এত রাত্রে?

···"দাসজী···ও দাসজী···"।

তাড়াতাড়ি সেমিজটা ঠিক করে নিয়ে মিলন শাড়ীটা কোমরে

জড়িয়ে নিচ্ছে, বৈঠকখানার দরজাটা খুলে একলাফে মন্দিরের রোয়াকে উঠে এল মাধব…বলল,

…শীগ্‌গির…শীগ্‌গির, চট্‌করে শাড়ীটা দাও তোমার—দাও…!

শাড়ীর একটা প্রান্ত ধরে সজোরে টেনে নিল মাধব। এক লহমায় পরে ফেললো সেটা তার গেরুয়া আলখেল্লার উপরেই। সেমিজের উপর শাড়ীর মত দেখাচ্ছে। ঘোমটা টেনে দিয়ে আবার একলাফে গিয়ে দাঁড়ালো সদর দরজার কাছে। সাড়া দিল,

—কে…কে আপনি ?

হতভম্ব মিলন মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে…গায়ে শুধু সেমিজটা। ব্যাপার কি ঘটেছে, ও যেন এখনো বুঝতে পারে নি। ওর যৌবন-পুষ্পিত দেহের মধ্যে মনটি আজো অনূঢ়…অনূঢ়ার মতই সে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু দেহ যেন সজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মাধব মেয়েলী সুরে ওখানে বলছে,

—কে আপনি ? কি চাই ?

—আমি বৌমা! আমি থানার দারোগা…রামজীকে একটু ডেকে দাও তো!—উত্তর এল বাইরে থেকে!

দারোগা! ভয়ে শিউরে উঠলো মিলন! এতক্ষণে সে অনুভব করলো তার অবস্থাটা! ছুটে বেরিয়ে গেল ওঘরে। কিন্তু সর্বনাশ! তার শোবার ঘরের চাবি যে রিংসমেত ঐ শাড়ীর আঁচলেই বাঁধা আছে! নিরুপায় মিলন পাশেই সিঁড়ির দরজায় ঢুকে পড়ল। এ দিকে ভদ্রবেশধারী একজন প্রৌঢ়, সংগে চৌকীদার, উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। আর একটু হলেই দেখে ফেলতেন মিলনকে!

মাধবও ঘোমটা টেনে সুদাসের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সুদাস জেগে উঠেছে। মাধব তার পাদুটো ধরে করুণ কাতর স্বরে বললো,

—বলো মামা, বলো যে মাধব এখানে আসেনি; তোমার পায়ে পড়ি মামা…বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে, খুনের দায়ে…

—দাসজী !···দারোগা ডাকলেন উঠোন থেকে।

—যাই !···সুদাস চাদরখানা গায়ে টেনে উঠে আসছে ! ঘোমটা দিয়েই মাধব গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা খুললো। এঁটো বাসনগুলো বার করে কুয়োতলায় নামিয়ে মাজতে বসলো। ওর লম্বা চুলগুলো মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে। সুদাস দেখলো একবার ; উঠোনে নামতেই দারোগা বললেন···কিছু মনে করো না দাসজী, সরকারী কর্ত্তব্য ; তোমার বাড়ীতে মাধব নামে কোন লোক এসেছে ? তোমার ভাগনে-না কি হয় শুনলাম ?

—মাধব ? বলপুরের মাধব ? খুব দূর সম্পর্কের ভাগনে। আমার বাড়ীতে··· ?

—সেইরকম খবর···মানে, এই জেলাতে সে এসেছে···রিপোর্ট পেলাম।

সুদাস বাসন-মাজতে-বসা মাধবকে একবার দেখে নিল। বলল,

—এখানে তো কৈ···শাহাপুরের ওদিকে যায় নি তো ? ওখানে তার বোনের বাড়ী···

যথেষ্ট ! দারোগাসাহেব আর শুনতে চান না। সুদাস আজন্ম সত্যবাদী ! জানে এ তল্লাটের সবাই। বিনীত কণ্ঠে দারোগা বললেন,

—তা হলে হয়তো তাই গেছে। কিছু মনে করো না দাসজী ! তোমার বাড়ীতে পুলিশের পোষাকে আসিনি আমি। চৌকীদার না আনলে উপায় নাই, তাই গাঁয়ের চৌকিদারকেই নিয়ে এলাম। কেউ শুধুলে বলবো, কাঁকড়াবিছে কামড়ানোর ওষুধ নিতে গিয়েছিলাম দাসজীর কাছে। আচ্ছা দাসজী···চললুম আমি।

দারোগা-সাহেব মন্দিরের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। সুদাস বললো···তামাক ইচ্ছে করুন !

—থাক্···থাক্···এই ভোর বেলা ! আচ্ছা, সাজাও তাহলে। খেয়েই যাই তামাক একটান !

সুদাস ভোর বেলায় তামাক খায়, তাই কলকেতে তামাক ভরে মিলন ঠিক করে রাখে। দারোগা মন্দিরের দাওয়ায় বসতেই সুদাস বললো,

—কলকেটা সাজো তো বৌমা···বললো মাধবের উদ্দেশেই। ঘোমটা ঢাকা মাধব হাত ধুয়ে টিকে ধরিয়ে কড়িবাঁধা বামুণে-হুঁকোটা সমেত এগিয়ে এল। দিল সুদাসের হাতেই।

—বৌটি তোমার বড্ড লক্ষ্মী দাসজী। আহা, বেঁচে থাক্!

—হ্যাঁ। ওকে নিয়েই যেক'টা দিন আর আছি···সুদাস হুঁকোটা দিল দারোগাকে।

—মাধব যদি আসে তো তাড়িয়ে দিও দাসজী···তোমার বাড়ীতে পুলিশের হাঙ্গামা করতে চাইনা আমি···ওর নামে পরোয়ানা আছে···। তামাক টানতে টানতেই বললেন দারোগা।

মাধব ঘোমটা দিয়েই ধীরে ধীরে সরে আসছে। সুদাস তাকালো রূঢ় দৃষ্টিতে। আজন্ম সত্যবাদী সুদাসকে আজ মিথ্যাকথা বলতে হচ্ছে এই হতভাগার জন্য। ধিক্! দেবে নাকি ধরিয়ে সুদাস? না; আর্ত, আশ্রিত, অসহায়কে রক্ষা করাই বৈষ্ণবের ধর্ম। হোক অসত্য বলার পাপ, গোবিন্দ মার্জনা করবেন। সুদাস কলকেটা নিতে নিতে বললো,

—কথাটা বলে ভালো করলেন। মহাপ্রভু আপনার মঙ্গল করুন।

তামাক খেয়ে দারোগা উঠে গেলেন···সঙ্গে চৌকিদারও। সুদাস আপন মনেই খানিক তামাক টানলো বসে বসে। মাধব বাসন মাজছে। ওর পরনে মিলনের সেই শাড়ীখানা···সেই শাড়ী, যেটা কাল সন্ধ্যায় পরেছিল মিলন। কঠিন···কঠোর হয়ে আসছে সুদাসের দৃষ্টিটা···হিংস্র হয়ে জ্বলছে যেন।

—মিলন!···ডাক দিল সুদাস। কণ্ঠস্বরের রূঢ়তা কিছুতেই গোপন করা যায় না। সুদাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো বৈঠকখানার দিকে। কিছু দেখা যায় না। মিলনের শোবার ঘরটার পানে তাকালো, তালা ঝুলছে। কোথায় মিলন? গেল কোথায়?

—যাই বাবা!—মিলন সাড়া দিল সিঁড়ির উপর থেকে। কিন্তু বেরুবে কি করে মিলন? এই বেশে কি বাইরে আসা যায়! প্রত্যুষের শীতলতায়ও ঘেমে উঠেছে মিলন।

ভোরের আলো তখনো দিনের প্রসন্নতায় পরিস্ফুট হয় নি···সুদাস রুক্তপদে এসে দাঁড়ালো কুয়োতলায়। কঠোর স্বরে মাধবকে বলল,

—যাও···চলে যাও!

—যাচ্ছি। করুণ কণ্ঠে বললো মাধব!

—এখুনি। এই মুহূর্তে···যা-ও!···সুদাস আঁচলটা ধরে টান মেরে খুলে নিল শাড়ীখানা, ঠিক যেমন করে মাধব কেড়ে নিয়েছিল মিলনের শাড়ী। চাবির রিংটা ঝিন্‌ঝিন্‌ করে উঠলো বন্দীর লৌহশৃঙ্খলের মত। শাড়ীটা ঘরের রোয়াকে ছুঁড়ে দিয়ে সুদাস বললো···বেরও··আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলো পশ্চিমদিকের খিড়কীর দরজাটা! ঠোঁটদুটো কাঁপছে মাধবের, কিন্তু সুদাসের অগ্নিদৃষ্টিতে আরো শুকিয়ে গেল। আস্তে এসে পেরেক থেকে ঝোলাটা টেনে নিয়ে মাধব খিড়কীর দরজা পানে এগুলো। সুদাস দরজাটা খুলে দিয়ে বললো···যাও···খবরদার, আর এমুখো হয়ো না···।

নত মস্তকে মাধব নদীর কিনারা ধরে হাঁটতে লাগল। সুদাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে···আর চেয়ে আছে মিলন উপরের সেই নরুণ পড়ার ঘরটার জানালা ফাঁক করে। দূর···দূর হয়ে গেল মাধবের দীর্ঘ দেহখানা···, কাশঝোপের আড়ালে একবার দেখা যাচ্ছে, আবার লুকিয়ে যাচ্ছে। মিলনকে এবার নামতে হবে। কিন্তু এঘরে কোনো শাড়ী নাই। বিছানার চাদরটাও পরা চলে না। তাড়াতাড়ি নেমে এসে মিলন রোয়াকে দাঁড়ালো, সুদাস তখনো খিড়কীর দরজায়। চাবিটা চট্ করে খুলে নিয়ে মিলন নিজের শোবার ঘরটা খুলে ঢুকছে, সুদাস ফিরে কঠোর কণ্ঠে ডাক দিল,

—মিলন!

—যাই!—ঠিক যেন ঘুম থেকে উঠে আসছে, এমনি ভাবে মিলন দরজাটায় বন্ধ করে বেরিয়ে এল রোয়াকে। কোমরে একখানা শাড়ী দ্রুত হাতে জড়িয়ে নিয়েছে, তখনো সামলাচ্ছে সেটা। বিস্রস্ত, বিপর্য্যস্ত বেশ। বাসর-ক্লান্তা স্বামী-সম্ভক্তা বধূ যেন···সমস্ত দেহখানা দলিত-বিদলিত দেখাচ্ছে। সুদাসের চোখের পাকাপাকা ভ্রূজুটো বেঁকে ধনুকবাঁকা হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। গম্ভীর হয়ে সুদাস মন্দির পানেই চলে গেল। মিলন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিস্তব্ধ মুহূর্ত্ত কয়েকটা। সুদাস মন্দিরের সামনে, ঠাকুরের পানে তাকিয়ে আছে, মিলন সুদাসের পানে। নদীর ওপার থেকে প্রভাতের আলো-লেখা তমলা গাছটার মাথা পেরিয়ে বাড়ীর চিলেকোঠার দেওয়ালে ঠেকলো, যেন নিয়তির শাণিত তরবারি।

"নারায়ণ মধুসূদন"···আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠলো অকস্মাৎ সুদাস। চমকে উঠেছিল মিলন···কিন্তু সুদাস যাচ্ছে ঐ তমাল গাছটার দিকে···সমাধির কাছে। কী ভাবছে সুদাস! কী ভাবছে মিলনের সম্বন্ধে? এমন অবস্থায় কী ভাবা উচিৎ তা বুঝবার মত বয়স মিলনের হয়েছে, কিন্তু মিলন প্রাণপণে যেন বলতে চাইছে···"সে নিরপরাধ···সে নিষ্পাপ···"কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না মিলনের···না, বেরুলো না কথা।

সমাধিটার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরছে সুদাস···যেন একটা বাঘিনী তার মৃত শাবকের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে···দেখছে মিলন। বৃদ্ধ সুদাসের জীর্ণ বাহু যুগলের পেশীগুলো জোঁকের মত ফুলে উঠেছে···কুঁজো সুদাস প্রায় সোজা হয়ে হাঁটছে···দেখে মনে হচ্ছে, যেন একটা জোয়ান মানুষ। ওর সর্ব্বাঙ্গে মৃত যৌবন আবার জীবিত হয়ে উঠলো··· আশ্চর্য্য!

কয়েকটা পাক দিয়ে সুদাস এদিকে এল···হুঁকো-কলকেটা তুলে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল সদর দরজার বাইরে। কোথায় গেল? মিলনকে ছেড়ে চলেই গেল নাকি! আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মিলন। বুকটা দুরু

ফুক করে উঠলো···কিন্তু, কিন্তু মহাপ্রভু জানেন, মিলন কোনো অন্যায় করে নি। কিছু অপরাধ করে নি। জানেন তিনি!

বড় বড় দুটো চোখ কেন-জানি অকস্মাৎ জলে ভরে গেল ওর। টপ্ টপ্ করে পড়ল কয়েক ফোঁটা। শাণবাঁধা রোয়াকে পড়ে জলের বিন্দুগুলো চারদিকে সরু সরু আঙুল বাড়াচ্ছে···ঠিক যেন ছোট ছোট অক্টোপাশ।

বাসনগুলো আধমাজা পড়ে আছে কুয়োতলায়। রান্নাঘরটা খোলা, ঠাকুর ঘরও। সুদাসের ঘরটাও খুলেই রেখে গেছে সুদাস···বৈঠকখানার এদিকের দরজাটাও হাঁ হাঁ করছে। বাড়ীতে যেন কেউ নাই। যেন পড়ো বাড়ী···হানাবাড়ী!

ওদিকে তমালতলায় কালো ছায়াটা···তার তলায় সমাধি···নিস্তব্ধ নিঝুম প্রত্যুষে মিলনের মনে ভীতির সঞ্চার করছে। সমাধিটাকে যেন জাগিয়ে দিয়ে গেল সুদাস; ওটা নড়ছে নাকি! নড়ছে? চোখদুটো ভালো করে মুছে মিলন তাকালো তাকাতে ওর কিন্তু ভয় করছে। ফর্সা হয়ে গেছে বেশ। এখন আবার ভয় কিসের? মনে সাহস আনলো মিলন।

উঠোনে নেমে মিলন ঐ সমাধিটির কাছ দিয়েই এগিয়ে গেল খানিকটা। দূরঃ···মরা আবার বাঁচে কোনোদিন! কাল সারারাত মিলন এই মন্দিরে ছিল···কৈ, নড় তো একটু শব্দও করে নি! মরেছে যে, সে মরেছে। মিলন খুব কাছাকাছি গেল সমাধিটার। ভিজে মাটিতে সুদাসের পায়ের দাগগুলো একটা বৃত্ত সৃষ্টি করেছে। করলা, কাঁকুড়, ঝিংএ লতাগুলো থেঁতলে-মেড়ে একাকার করে দিয়ে গেছে সুদাস। কি এমন রাগের কারণটা ঘটলো! কী এমন অপরাধ করেছে মিলন! মাধবের কাছে শুতেও যায় নি··· হাসিঠাট্টাও করে নি। পুলিসের ভয়ে শাড়িটা হিঁচড়ে কেড়ে নিয়েছিল মাধব ···তাই অত কাণ্ড। না নিলে মাধবের আর কি উপায় ছিল! ধরে নিয়ে যেতো দারোগা।

কিন্তু কিসের জেলে? কী করেছে মাধব? চুরিচুরি কিছু করে

পালিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি ! কিম্বা স্বদেশী করেছে ? স্বদেশী করে তো অনেকে জেলে যায়···আবার কেউ কেউ পালিয়েও তো বেড়ায়। চুরি মাধব করতে পারে না। কার জন্য করবে ? কি জন্য করবে ? ও নিশ্চয় স্বদেশী করেছে···ঐ যেমন বামুণদের গৌর, কায়েতপাড়ায় কান্ত, ময়রাদের শ্রীবাস···ওরা সবাই তো জেলখাটা লোক ! গৌরঠাকুর দুবার জেলে গেছে। ফিরে এলে গাঁয়ের ছেলেরা তাকে ফুলের মালা পরালো ! খাতির কত ! নরু ছিল গৌরএর বিশেষ বন্ধু, এক সঙ্গে পড়তো। বেঁচে থাকলে নরুও অমনি জেলে যেতো হয়তো ! নরু যেতে পারনি, মাধব গেছে, না-হয় যাবে। স্বদেশী করে জেলে যাওয়া—সেতো গৌরবের বিষয় ! ভালো কাজ ! না ! মাধব চোর হতে পারে না। না—নাঃ।

মিলন ফিরলো ওখান থেকে। মন্দিরে উঠে ছড়াঝাঁট দিল। উঠানেও দিল। কুয়োতলায় বাসনগুলো মাজতে বসল ! হাসি পাচ্ছে মিলনের—প্রাণের দায়ে লোকটা "মিলন" সেজে বাসন মাজতে বসে গেল কেমন ! কিন্তু বুদ্ধি আছে—আশ্চর্য্য বুদ্ধি ! চট্‌করে কেমন সোজা উপায়টা বার করে নিল ! ঘরের ভিতর মিলন খিল দিয়ে শুলে ও শাড়িটা তো নিতে পারতো না—বিপদে পড়ে যেতো তাহলে। স্বদেশী লোক—মহাপ্রভু তাই ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। ওরই কপাল জোর—তাই মিলন কাল মন্দিরে শুয়েছিল।

বাসন মেজে ঘরে তুললো মিলন। এবার স্নান করতে যেতে হচ্ছে কিন্তু সুদাস এখনো ফেরে নি। গেল কোথায় ! একা ঘর কার জিম্মেতে ছেড়ে দিয়ে স্নান করতে যাবে মিলন ! চারিদিকে চোর-চণ্ডাল। কিন্তু বেলাও তো হোল অনেকখানা। স্নান না করে আর কিছু করবার নেই।

ঘরের বারান্দায় উঠে মিলন সেই শাড়ীটা টেনে নিল—কাচতে হবে। মাধব এখনি পরেছিল এটা। কয়েক জায়গায় জল লেগে গেছে। ছুটো কোঁকড়া চুল লেগে আছে—মাধবের চুল। শাড়ীটার প্রান্ত ধরে তান

হাত থেকে বালতিতে নিয়ে গুছাচ্ছে মিলন। ঘাটে নিয়ে যাবে কাচতে। গুছানো হয়ে গেল; শ্বশুর কিন্তু এখনো ফিরছে না। খানাতেই আবার গেল নাকি বুড়ো! বেলা তো বেশ হয়ে উঠলো। নাঃ, মিলন আর অপেক্ষা করতে পারে না। গুছানো শাড়ীখানা একটা দড়িতে টাঙিয়ে দিয়ে মিলন গামছা নিয়ে কুয়োতলায় এল। কেউ কোথাও নেই—এইখানেই স্নানটা করে নেওয়া যাক আজকার মত। কতো কাজ বাকি—ঠাকুরের ফুল তোলা, নৈবেদ্যি সাজানো—চন্দন ঘষা—করবে কখন মিলন!

কিন্তু কুয়োতে স্নান করে বেশ তৃপ্তি হয় না। বর্ষাকালের গরম—তার উপর কাল সারাটা রাত মিলন একটুও ঘুমায় নি—গা' ডুবিয়ে স্নান করতেই ওর ইচ্ছে করছে। কি করবে ঠিক করতে না পেরে মিলন কুয়োতলায় বাঁধানো শাণে বসলো—চুলগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে তেল মাখাতে লাগলো বসে বসে। কুয়োর জলটা বেড়ে গেছে, জমি থেকে তিনচার হাত নীচেই জল—চমৎকার স্বচ্ছ জল—প্রতিবিম্ব পড়েছে মিলনের মুখখানার,—উঁকি দিয়ে দেখল মিলন—কালো চুলগুলোর বেষ্টনীতে একখানা সুন্দর মুখ যেন স্ফটিকের কৌটায় ভরে রাখা হয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে; বালতি নামালেই জলে ঢেউ উঠবে আর মূর্তিটাও ঢেউ খাবে—ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাবে—চুরমার হয়ে যাবে—ঐ অত সুন্দর মুখখানা, কাটা-কাটা ছেঁড়াছেঁড়া হয়ে যাবে—মিলিয়ে যাবে শেষটায়!

বালতিই নামিয়ে দিল মিলন। মুখটা আর দেখা যায় না—বেশ হয়েছে! মিলনের এত সুন্দর প্রতিবিম্ব থাকতে নেই। বালতি ভর্তি জল তুলে মিলন গামছা ভিজালো। গা'হাত মাজলো—এখনো যদি সুদাস ফেরে তো সে নাইতে যেতে পারে—কিন্তু কৈ! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে মিলন! বেলা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বালতি জল ঢেলে নিল পায়ে-মাথায়—বেশ তৃপ্তি হচ্ছে না—আরো কয়েক বালতি ঢাললো!

এ ঘরে এসে কাপড় ছাড়লো—তারপর ফুল তুলতে এল সাজি হাতে।

হাতের চুড়ি ক'গাছা অনেক দিনের—ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিহি হয়ে গেছে। ও বাক্সোয় যে কি দরকার! খালি হাত করে দেবে নাকি মিলন!—থেকে, সেই ভালো!

থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে—নাগাল পাচ্ছে না। ঝাল হয়ে মিলন কঞ্চেটা পাড়লো। করবী তুললো, গোপাটি কটাই ফুটেছে, তুলে নিল—রাখলো গিয়ে ঠাকুরঘরে। মূর্ত্তির দিকে তাকালো একবার। মুখের হাসিটি যেন আরো মধুর লাগছে! বিপদতারণ উনি—মাধবকে বাঁচাবার জন্যই মিলনকে এখানে কাল শুইয়েছিলেন।

—"তুমি জানো—তুমি তো জানো ঠাকুর—তোমার কাছেই আমি ছিলাম কাল—তুমি সাক্ষী আছ!"—মিলন বাইরে আসবার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখলো—ওঘরের রোয়াকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে কখন স্বদাস—মাধবের পরিত্যক্ত শাড়িটার কুঞ্চনগুলো খুলে খুলে গভীর অভিনিবেশে কি যেন পরীক্ষা করছে। মিলন দাঁড়িয়ে গেল মন্দিরের দুয়ারেই।

* * * * *

কি যে দেখলো, স্বদাসই বলতে পারে। শাড়খানা আবার কুঁচিয়ে আলনায় তুলে দিয়ে লম্বা রোয়াকটায় খানিক পায়চারি করলো—ধীর দৃঢ় পদক্ষেপ! মিলন তখনো দাঁড়িয়ে মন্দিরের দরজায়। যেকোনো মুহূর্ত্তে একটা বজ্রপাত হতে পারে যেন—মিলন তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু বজ্রপাত হোল না। কিছুই হোল না, স্বদাস গামছা নিয়ে কমণ্ডলু হাতে স্নান করতে বেরিয়ে গেল সদরের পথে। ফিরতে অন্ততঃ আধঘণ্টা। কৈ—কিছু তো বললো না! তা হলে ও বুঝেছে, মিলন নিরপরাধ—মিলন নিষ্পাপ। ঠাকুর তো আছেন—ঠাকুরই বুঝিয়ে দিলেন। কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে তাকালো মিলন আবার ঠাকুরের পানে। কী সুন্দর মুখখানি, কী অনুপম সুন্দর! ইচ্ছে করে, বুকের মধ্যে চেপে ধরি! আহা!

শুনেছে মিলন—সুদাসের পূর্বপুরুষ কে একজন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই দেববিগ্রহ—মন্দিরও তাঁরই তৈরী করানো! নইলে এ যুগে ওরকম পাথরের মন্দির তৈরী করা অসম্ভব! মিলন শুনেছে—দেখেছেও—এই বংশের সম্মান অসীম। বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রণাম করে সুদাসকে ; গুরুদক্ষিণা প্রায়ই আসে ডাকমারফৎ ; —তাঁরাও আসেন পালে-পার্ব্বণে! এই তো ঝুলন আসছে। সে সময় অনেকে আসেন—মিলনের খাটুনি বিস্তর বেড়ে যায়—কিন্তু আয়ও হয় যথেষ্ট—নইলে সাত-আট বিঘে ধান-জমিতে দুজনের ভালোভাবে চালানো যেতো না। ওঁরা আসেন, দু'একদিন থাকেন—প্রণামি দেন—চলে যান। পূর্ণিমার দিন মহোৎসব হয়—ঠাকুরকে কতো সুন্দর করে সাজায় মিলন। সাজাতে সাজাতে ভাবে মিলন—শ্রীরাধা হয়তো আরো ভালো করে সাজাতেন। মিলন ঠিকমত পারছে না। সবাই কিন্তু প্রশংসা করে মিলনের। ঠাকুর নিজের ইচ্ছে মতই সেজে নেন—প্রশংসাটা পায় মিলন। ঠাকুরের ইচ্ছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মিলন এ ঘরে এল। সুদাসের জন্ত শুকনো কাপড় বার করে রাখলো—পা ধোবার জল রাখলো গাড়ুতে। হরি নামের ঝোলাটি মাথায় ঠেকিয়ে রাখলো ঠিক জায়গাটিতেই—সুদাস এসে মালা পরে পূজা করবে! রান্নাঘরে ঢুকতে হবে এবার। উনুনটা জ্বেলে দিয়ে মিলন তরকারীগুলো বানিয়ে ফেলবে নাকি—না, তরকারি বানিয়ে তারপর উনুন জ্বালবে—কোনটা আগে করা উচিৎ! অন্ত দিন এতো তো বেলা হয় না—সব কাজ সময় মত হয়। আজ যেন কাজগুলো সব নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে! ধেৎ, বসে থাকলে চলবে না। তরকারীর ডালাটাই বার করলো!

সুদাস এসে পড়েছে! নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে হরিনামের ঝুলি নিয়ে মন্দিরে ঢুকলো গিয়ে। মিলনও থাকে ওখানে এ সময়। থাকাই উচিৎ। মিলন তরকারী রেখে উঠে গেল মন্দিরের রোয়াকে ; সব ঠিক করা আছে—

যেখানে যা-কিছু সব। কিন্তু সুদাসের হাতে পদ্ম-পাতার একটা ঠোঙা। কী ওতে? ফুল—ফুলে এনেছে কোথা থেকে! কেন? ফুল তো তুলে রেখেছে মিলন—তবে কি—তবে কি…!

মন্দিরের ভেতর থেকে সুদাস দরজাটা বন্ধ করে দিল—মিলন তখনো ভেতরে ঢুকবার অবসর পায় নি। বন্ধ করে দিল সুদাস দরজাটা! কেন? কেন? কেন!

—বাবা!

—যাও এখান থেকে!—রুদ্ধ ঘর থেকে আওয়াজ এল একটা। যেন বাঘের গোঙানী! কিছুই বোঝা গেল না কথাটায়। অভাগী মিলন ঐখানেই বসে পড়লো বুক চেপে। পাথর হয়ে গেছে যেন মিলন! কতক্ষণ, কে জানে? রোদ লেগে পিঠখানা সিঁদুর হয়ে উঠেছে—মাথাটা এলিয়ে পড়েছে দেওয়ালে—চোখদুটোতে দৃষ্টি আছে কি না—কেউ বুঝবে না—সুদাস দরজা খুললো—"হরে মুরারে, মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ…" দৃষ্টি পড়ল মিলনের পানে। কঠোর, কঠিন দৃষ্টি, পাথরকেও যেন পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। খড়মের চটাং চটাং শব্দ করে সুদাস নেমে গেল রোয়াক থেকে—তারপর সদরের দিকে—রাস্তায়।

ওঃ! এই নারী! এই বেনো জল দিয়ে ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে সুদাস এতকাল! তার পূর্ব্বপুরুষ—শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদের পরমভাগবৎ ৺ব্রজবল্লভ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের পুণ্য-মৃত্তিকায় বিষ-বল্লরী! নাঃ, সুদাস এ সহ্য করবে না। ওর হাতের ছোঁয়া ফুল দিয়ে আর দেবতার পূজা হয় না—ওর হাতের অন্ন আর সুদাসের গলায় গলবে না—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সুদাস আর নরুর কথা ভাববে না। নরুর কথা এবার একাই ভাববে সুদাস—আর কেউ না, কেউ না আর! আর কেই বা আছে ভাববার? এতকাল সুদাস বিশ্বাস করতো—মিলন ভাবে—নরুর জন্য সে চিরবিরহিনী রাধা সেজে বসে

থাকে—সে বাসকসজ্জিতা হয়, সে অভিসারিকা হয়—সে মানিনী হয় নরুর জন্ত। না-না-না, সুদাসের ভুল ভেঙেছে আজ।

এ কী করলো মিলন! কেন করলো! মিলনের অপরাধ আজ এতে কতখানি! মাধবের মত অতি নগণ্য একটা লোক এত সহজে, এত অনায়াসে বশ করলো মিলকে? আশ্চর্য্য! মিলন—সুদাসের হাতে গড়া মিলন, শ্রীরাধার আদর্শে অনুপ্রাণিতা, শ্রীমীরার আদর্শে গঠিতা—সেই মিলন এমন করে ধ্বংস করে দিল সুদাসের সব শিক্ষা, সব অহঙ্কার! হায়রে কলির জীব!

"হরি নাম সত্য, হরি নাম সত্য"—পাতকী তরাতে এই নামব্রহ্মই একমাত্র উপায়; মহাপাপী আমি প্রভু—কত জন্মের কত পাপ সঞ্চিত আছে, এ তারই শাস্তি। নইলে নরুর মত ছেলে যাবে কেন! নরুর তুচ্ছ স্মৃতিটুকুর এ অপমান আমায় সইতে হোল কেন! নরুর পৈত্রিক ভিটেতে নরুর বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে ব্যভিচার করে গেল একটা খুনী শয়তান—ওঃ ওঃ—সুদাস নদীর বালিতেই বসে পড়ল। বালি গরম যেন আগুন। সুদাস এই অগ্নিকুণ্ডে ঢুকে যেতে পারে না?—সীতাদেবীর মত পাতালে চলে যেতে পারে না! না—পারে না। সুদাসের পৈত্রিক বিগ্রহ এখনো সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। সুদাসের অপত্যস্নেহ এখনো বাঘিনীর চেয়ে একবিন্দু কম নয়—সুদাসের শক্তি এখনো তার বয়সের যে-কোনো বৃদ্ধের চেয়ে বেশী—সুদাস উঠে দাঁড়ালো।

দীর্ঘদিন ব্রহ্মচারী, আতপান্নভোজী সুদাস রোদবৃষ্টিকে গ্রাহ্য করে না—গ্রাহ্য করে না কালের ভ্রূকুটিকে, মৃত্যুর শীতলতাকে। সুদাস এখনো অন্ততঃ বিশ বছর বাঁচবে। বাঁচতেই হবে সুদাসকে। ব্রজবল্লভের বংশ কিছুতেই ধ্বংস হতে পারে না—নির্ব্বংশ হতে পারে না, পারে না!

সুদাস নদীর জলে নামলো। প্রায় হাঁটুজলে নেমে গেল। পরণের গৈরিক বাস গুটিয়ে আরো খানিকটা নামলো। স্রোতটা বড্ড প্রখর—

পায়ের তলায় বালি সরে যাচ্ছে, শিরশির্ করছে সুদাসের শরীর—আরো, আরো খানিক—জল কোমর ছাড়িয়ে উঠলো। পেরুতে পারবে তো সুদাস? হ্যাঁ—নিশ্চয় পারবে। কত আর হবে জল! ডুবজল হবে না-হয়। জলটা এদিকে কতখানা উঠেছে? ওঃ, অনেকখানা—তমাল গাছটার কাছাকাছি। নরুর সমাধিটা দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু তমাল গাছের মাথা আর তার ফাঁকে মন্দিরের চূড়াটি দেখা যায়। ঐ যে—ঐ মহাপ্রভু, উনি দেখুন—সুদাস চেষ্টার ত্রুটি করবে না ওঁর জন্য! ওঁর পূজার জন্য সুদাস বংশধর রেখে যাবে। সময় কি এতোই অতীত হয়ে গেছে? না—সুদাস বাঁচবে আরো কুড়ি বছর!

বুকজল ওঠে গেল—স্রোতের টান ভয়ানক, কিন্তু যেতেই হবে সুদাসকে। লক্ষ্মণপুরের মোহান্তর মেয়েটা এখনো কণ্ঠিবদল করে নি। বয়স প্রায় পঁচিশ, দেখতেও খারাপ নয়—ওকেই নিয়ে আসবে সুদাস। আজই—এখনি। সুদাসের যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও নিয়ে আসবে, আর এনেই ঐ হারামজাদী মিলনকে তাড়াবে বাড়ী থেকে। ওর মুখ আর দেখবে না সুদাস, দেখবে না।

সুদাসের সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস জেগে উঠলো। রক্তটা যেন ফুটছে টগ্‌বগ্ করে। স্রোতের গেরুয়া জলটাকে দুহাত দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে সুদাস, যেন কোমল নারীদেহ—গৈরীকবাস। বৈষ্ণবী। সুদাসের চোখদুটো ঠিক নবীন প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে। মুখের হাসিটাও। বৈষ্ণবী দুষ্টুমী করছে সুদাসের সঙ্গে; সরতে চাইছে না, সুদাসকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নামোদিকে; গলাজলে পড়ে সুদাস সামনে আর এগুতে পারছে না—নীচের দিকেই যাচ্ছে। সর্ব্বাঙ্গে একটা বিপুল পুলকাবেশ—অধোগতির একটা স্বচ্ছন্দ বিলাস-বিভ্রম! কিন্তু সুমুখে যেতে হবে যে! সুদাস চেষ্টা করেও এক চুল এগুতে পারলো না। রজনী-বিলাসের পরবর্ত্তী শ্রান্তির মত সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। হাত-পা এলিয়ে ভেসে দিল সুদাস—, জলের শয়নে বিশ্রাম করছে যেন।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে? নিয়ে—নিরয়ে; ওর আধ্যাত্মিক অধোগতির পথে, ওর পারমার্থিক মুক্তির বিরুদ্ধে, ওর আজন্ম অর্জিত নিষ্ঠার বিপরীত বন্ধনে, ওর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যতিক্রমে, ওর সত্যানুশীলনের মিথ্যাচারে!

হ্যা, মিথ্যাচার। মিথ্যাচার বৈ কি আর? বিশবছরের মিলন যদি ব্যভিচার করতে পারে তো পঁচিশবছরের ভুক্ত-যৌবনা ঐ মোহান্তর মেয়ে যে করেনি, তার প্রমাণ কোথায়? আবার কিছু করবে না, তারইবা নিশ্চয়তা কি! বৃদ্ধ সুদাস তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল! এমনি নির্ব্বোধ সুদাস—গোবিন্দ সামলে দিয়েছেন। —জলের স্রোতেই কাৎ হয়ে সুদাস ভাসছে। মন্দিরের চূড়াটি দেখা যাচ্ছে—চিকচিক করছে রোদ লেগে—কিন্তু দূর—দূর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! ওঃ, অনেকখানা তো ভেসে এসেছে সুদাস। এতোখানা অধোগতি হয়ে গেল তার! "গোবিন্দ—গোবিন্দ—" সুদাসকে রক্ষা কর, বাঁচাও এই প্রলোভনের হাত থেকে।

সুদাস প্রাণপণ বলে সাঁতার কেটে এই কূলেই উঠলো এসে। বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল এসে পড়েছে, হাটতলার কাছেই উঠলো। আজ হাট নাই, জায়গাটা শূন্য—খাঁ খাঁ করছে! একটা বৃষোৎসর্গের ষাঁড় রোমন্থন করছে দাঁড়িয়ে—ঐ একমাত্র প্রাণী আজ ওখানে! বৃষোৎসর্গের ষাঁড়—কোন্ মৃত ব্যক্তির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে, বংশ বৃদ্ধি করে, ভালো করে। নরুর নামে যদি একটা ষাঁড় উৎসর্গ করে দিত সুদাস তো বেশ হোত। কিন্তু ছিঃ! কী সব অধর্ম্মের কথা ভাবছে সুদাস! নরু আছে। আছে নরু—নরুর বৌ আছে—মিলন—সুদাসের মিলন-মা! সুদাসের চোখদুটো বাংসলো জলজল করে উঠলো—বৌমা—মিলন-মা!

ওঃ, কতক্ষণ দেখেনি মেয়েটাকে—কত—ক্ষ—ণ! দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। যেন মরা একটা মানুষ! নাঃ! সুদাস ক্ষমা করবে, ক্ষমাই করবে মিলনকে। ছেলেমানুষ, করে ফেলেছে একটা অন্যায়। কী আর করা যাবে তার! এতো কষ্টের মানুষকরা মিলন, এতো যত্নের

বৌমা মিলন। কী এমন তাকে সুখে রাখতে পেরেছে সুদাস! কিছু না, কিছু না।

সুদাস দ্রুত ফিরতে লাগলো ঘরমুখে। ভিজে কাপড়টা বাধা দিচ্ছে,—পায়ে বাধছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না সুদাস—হাঁপিয়ে উঠলো। গো-করঞ্জাগাছের ছায়ায় একটু দাঁড়ালো। একটা জেলে খালুই ভর্তি মাছ নিয়ে যাচ্ছে—ডাক দিল—দে, দে একপোয়া!

সুদাসের খাতির সর্বত্র। জেলেটা তৎক্ষণাৎ একপোয়া মাছ ওজন করে দিল দুটো করঞ্জাপাতায়। ডান হাতে মাছগুলো নিয়ে সুদাস আবার আসছে—ভাবছে,—বকবে বৌমা আমার, বলবে, আবার তুমি হাতে করে মাছ এনেছ বাবা! গন্ধ হবে যে হাতে! বকে' ধমকে হাতখানা গোবর দিয়ে মেজে দেবে, সরষের তেল বুলিয়ে দেবে—কাল যেমন করে বুলিয়ে দিয়েছিল। আহা, মিলন, মা আমার! এত্তোটুকুটি তোকে মানুষ করেছি। তুই যে আমার মেয়ে, মেয়ে, মেয়ে—নরুর থেকে তুই কিছু কম নোস! নরুর বৌ মরলে আমি নরুর আবার বিয়ে দিতাম, তোরইবা কেন দেব না!—দেব। আমি নিজে খুঁজে এনে তোর কণ্ঠিবদল করিয়ে দেব—কিন্তু মাধবকে না—মাধব আসামী; কে জানে কি তার অপরাধ!... হয়তো চোর, হয়তোবা আরো ভয়ঙ্কর, খুনী। না—না—না মা, মাধব তোকে সুখী করতে পারবে না—ও বেয়াড়া, বজ্জাত!

সদর দরজাটা হাঁ হাঁ করছে। চড়চড়ে রোদ! মিলন সেই মন্দিরের দাওয়ায় দেওয়াল ঠেস দিয়েই বসে আছে—তেমনি—যেমনটি সুদাস দেখে গিয়েছিল। সারা গা'টা লালচে হয়ে উঠেছে রোদে—আহা!

—বৌমা! মিলন!—সুদাস পরম স্নেহে ডাক দিল। মাছগুলো উঠোনে ফেলে দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল মিলনকে—আমি কিছু বলবো না—কিছু না মা—ওঠ্!

—বাবা!—কি যেন বলতে যাচ্ছিল মিলন।

—থাক—থাক! আয় উঠে আয়। শীর্ণ হাতের সমস্ত জোর দিয়ে সুদাস কচি খুকীর মতন মিলনকে নামিয়ে আনলো দাওয়া থেকে। নিজের ভিজে কোঁচার খুঁট দিয়ে মিলনের মুখখানা মুছে দিতে দিতে বললো, —কিছু বলতে হবে না—যা রান্না কর—খেতে দে মা, খিদে পেয়েছে যে! মিলনের শুকনো চোখদুটোর কাণায় কাণায় ভরে এল জল।

উনুনের আঁচটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কয়েকখণ্ড কয়লা নিজেই তাতে ফেলে দিয়ে সুদাস টিকে ধরিয়ে নিল একটা—তারপর কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে টানতে আরম্ভ করলো ঐ রান্নাঘরেই। মিলন ওঘরে গিয়ে ঢুকেছে। মনের আবেগটা সামলাতে কয়েক মিনিট লাগলো ওর! অভিমানী অন্তর ওর কেমন যেন চিড় খাচ্ছে। বিনাপরাধে শ্বশুরের এই সন্দেহ, এতক্ষণ ও সয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্বশুর বুঝেছে—এতক্ষণে বুঝেছে, মিলন নিরপরাধ! ভগবান আছেন—তিনি জানেন, তিনি দেখেছেন। তাই শ্বশুরকে আবার ফিরিয়ে এনে দিলেন। কিন্তু মিলনের অভিমানটা এখন যেন আরো বেশি হয়ে উঠেছে! বাবার থেকে বেশি ভালবাসে মিলন শ্বশুরকে, তিনি কেন খামোকা সন্দেহ করেছিলেন মিলনের উপর—ছিঃ!

কিন্তু সামলে নিল মিলন। শ্বশুরের কাছে পাওয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের স্নেহটাই ওর চোখে বড় হয়ে উঠলো। যে কদিন শ্বশুর আছে, সে-কদিন মিলন কোনো কাজেই তাকে ব্যথা দেবে না—কোনো আচরণেই না! মিলন কালকার আনা চিনির অবশিষ্টটুকু দিয়ে সরবৎ তৈরী করলো এক গ্লাস। একটা পাতিলেবু কেটে রস ঢেলে দিল—তারপর এসে সুদাসের কাছে দাঁড়ালো গ্লাস হাতে!

—কি রে মা? সরবৎ? দে, খাই!—হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চোঁ-চোঁ করে অর্দ্ধেকটা খেয়ে সুদাস বাকি অর্দ্ধেক মিলনের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলো—খা—খা রোদে পুড়েছিস!

থেকে হোল মিলনকে। হুঁকোতে আরো গোটা কয়েক টান দিতে দিতে সুদাস উঠোনে নেমে বলল—আলু-কলা সেদ্ধ আর ভাত কর। তোর জন্ত মাছ ভেজে নে। বড্ড বেলা হয়ে গেল—বুঝলি মা, আজ আর বেশি কিছু রাঁধিস না এবেলা!

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে সুদাস বেরুলো আবার ঘর থেকে। খানিকটা দূরেই রাধারাণীদের বাড়ী। রাধাদের তখন খাওয়াদাওয়া চলছে। রাধার বাবা শ্রীচৈতন্তদাস বাইরের ঘরে ভাগবৎ পড়ছিল—সুদাস উঠে গেল সেখানেই। ব্যস্ত হয়ে চৈতন্ত বলল,

—দাদা যে? এসো, এসো! খাওয়া হোল?

—না রে ভাই। বৌটার আজ আবার শরীর ভালো নাই, রান্নার দেরি হবে!

—ওঃ, তা রাধাকে ডাকলেই পারতো। রেঁধে দিয়ে আসতো গিয়ে!

—থাক—এমন কিছু নয়। রাঁধছে। একটু দেরী হবে। কি পড়ছিস পড়। শুনি একটু!

কিন্তু সুদাসের কাছে ভাগবৎ পড়বে, এতবড় পণ্ডিত এ তল্লাটে এখনো জন্মায় নি! সুদাস শুধু পণ্ডিত নয়—সুদাস সাধক। ওর অঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতি, ওর চোখে অসীমের অনুসন্ধানের আকুতি, ওর অন্তরে চিদানন্দের রসঘন মূর্ত্তি! চৈতন্ত বিনীত কণ্ঠে বললো—তোমার কাছে আমি পাঠ করবো দাদা?—নাও, শুনি একটুন্!

দুহাতে বইখানি নিয়ে সুদাস প্রথম মাথায় ঠেকালো—তারপর আরম্ভ করলো। সুদাসের কণ্ঠস্বর আজও অপরূপ। সুরের বন্যা বয়ে যেতে লাগল ঘরের মধ্যে—শ্রীগোবিন্দও হয়ত এ গান না শুনে পারবেন না। দরজা জানালার আড়ালে পাশের বাড়ীর বৌঝিরা এসে দাঁড়িয়েছে! স্তব্ধ মধ্যাহ্ন—নির্বাক শ্রোতার দল। সুদাসের দুই চোখে দরবিগলিত ধারা—অপর কেউ হলে চোখে দেখে পড়তে পারতো না—সুদাসের মুখস্থ আছে;

কোথাও এতোটুকু খলন হোল না সুরের। পরিচ্ছেদ শেষ করে থামলো সুদাস।

কোন্ এক অমৃতমন্ত্রে যেন স্তম্ভিত হয়ে ছিল পাড়াটা এতক্ষণ। কতদিন ওরা শোনে নি সুদাসের কণ্ঠে এমন করে ভাগবৎ পাঠ—পাঠ থামার পরেও সবাই চুপ করে আছে।

রাধা এসে বলল—বৌদি রান্না করে বসে আছে জেঠামশায়।

—যাই মা—যাই! ওঃ, বড্ড দেরী করে ফেললাম। মেয়েটা কিছু খায় নি সকাল থেকে। একেবারে উপোস আছে—যাই মা—যাই—সুদাস এইখান থেকেই সাড়া দিল যেন মিলনকে!

আর একবার উপচে পড়লো জল সুদাসের চোখ থেকে—কে জানে শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশে কিম্বা অভাগী মিলনের জন্যই!

নদীর কিনার ধরেই দীর্ঘ পথ চলে গেল মাধব; কাত্যার জঙ্গলটা কাছিয়ে আসছে—ওপাশে মালক-পাহাড়ের উঁচু মাথাটা দেখা যায়—তিনকোনা, যেন একটা প্রকাণ্ড পিরামিড্। এদিকে কখনো আসেনি মাধব পূর্ব্বে; রাস্তা একান্ত অজানা। ভেবেছিল, কোনো গ্রাম পেলে কিছু খেয়ে নেবে, কিন্তু এতটা রাস্তার মধ্যে গ্রাম তো দূরের কথা, একটা মানুষেরও দেখা পায়নি। বেলা অনেকটা হয়েছে—নিজের ছায়াটা ছোট হতে হতে এক হাত হয়ে এল—ছায়ার মাথায় পা পড়ছে মাধবের; মধ্যাহ্ন।

জঙ্গলটা বেশ গভীর। বাঘ-ভাল্লুক নাই তো! একটু যেন ভয় হতে লাগল মাধবের। আর এগুবে কি না ভাবতে লাগল। কিন্তু পিছিয়েই বা যাবে কোথায়! যে পথে এল সে পথ তো বন্ধ। সামনেও বন—বাঁদিকে নদী, তার ওপারেও বন। নদীটা বনের মাঝ দিয়েই চলে এসেছে। আজ যেন নদীর বানটা একটু বেশী। ফুলে ফুলে উঠছে তার

গৈরিক জলস্রোত—আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হয়ে উঠছে ঠাঁই ঠাঁই! কাল যখন নদীটা পার হয়েছিল মাধব—তখন জল ছিল একগলা, আজ বোধহয় দু'মানুষ জল হবে। পশ্চিমে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, তাই জল বেড়েছে। এগুলো গিরিনদী—হঠাৎ জল বাড়ে আবার হঠাৎই কমে যায়। কিন্তু জল কমে গেলেই বা কি! মাধবের যাবার মত কোনো জায়গা নাই এদিকে। ফিরেই যেতে হবে তাকে অতঃপর, কিন্তু কোথায়? শাহাপুরে গেলে হোত, কিন্তু সে হচ্ছে ওদিকে, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে—সুদাসের বাড়ী পার হয়ে যেতে হবে। শাহাপুরেই যে মাধব নিরাপদ হবে, তারই বা ঠিক কি? সে আবার বাজার গাঁ—পুলিশ সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবের খাতির করে না—রীতিমত খানাতল্লাস করে!

মাধব একটা বড় গাছের ছায়ায় বসলো। কাল রাত থেকে জল পিপাসা পেয়েছে, কিন্তু নদীর ঘোলা জল খাওয়া চলে না। বিড়ি বার করে ধরালো মাধব। উদ্বেল—আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতোস্বিনী—গান মনে পড়ছে মাধবের—"তাহারই স্রোতে আঁকা, বাঁকাবাঁকা তব বেণী" সত্যি! শৈলীর বেনীটা এমনিই ছিল, এমনি বাঁকাবাঁকা—এমনি ভীষণ ভয়ঙ্কর—মনোভিরাম! বেণীর আগায় রাংতা জড়ানো ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে সে যখন বেরিয়ে আসতো বিকাল বেলা,—মনে হোতো যেন হারেম থেকে নবাব-নন্দিনী বেরুলেন। রূপের তীক্ষ্ণতা আর দলের সেরা মেয়ে হওয়ার গর্ব্ব ওকে নবাবী মন-মেজাজ দিয়েছিল। মেয়েটা কিন্তু নির্ব্বোধের একশেষ! বাসর ঘরে ঐরকম কথা না বললেই চলতো ওর। মাধবের মেজাজ তাহলে খাপ্পা হোত না—শৈলীও মরতো না—মাধবের এই নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করবারও দরকার হোত না। কিন্তু মরেছে, ভালই হয়েছে। অমন শয়তানী মেয়ের মরাই দরকার। কত লোকের কত সর্ব্বনাশ সে যে করেছে আর ভবিষ্যতে করতো, কে জানে? মাধব পৃথিবী থেকে একটা মহাপাপকে বিদায় করে দিয়েছে।

আত্মপ্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা করছে মাধব—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, শৈলীকে বিয়ে করতে যাবার দরকার কি ছিল তার? অধিকারীর কাছে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেই পারতো। কিন্তু ওরা পুলিশ লেলিয়ে দিত তা হলে! দিত—দিত; খুনের দায়ে তো পড়তে হোত না। এমন করে কত দিন পালিয়ে বেড়াবে মাধব! এ কি পারা যায়! নাঃ, সে আত্মসর্পণ করবে। যা হয় হোক—এ কষ্ট আর সওয়া যায় না!

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলো মাধব অকস্মাৎ—যেন এখনি, এই মুহূর্তে সে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। সমস্ত কথা খুলে বলে বিচারকের দয়ার প্রার্থনা করবে, তাহলে ফাঁসি নাও হতে পারে; কিন্তু দ্বীপান্তর! দ্বীপান্তর হবেই। কোথায় কোন আন্দামান না কি একটা যায়গা—উঃ ভাবা যায় না। ভাবতে ভয় করে, শরীর শিউরে ওঠে!

অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল মাধব আবার। এখনো সে স্বাধীন আছে; এখনো সে নিজের খুসীমত বসতে পারে, উঠতে পারে, যা ইচ্ছে, খেতে পারে— যে কথা ইচ্ছে ভাবতে পারে। হোক না পলাতক জীবন—তবু আজো সে স্বাধীন। এর মূল্যই কি কম কিছু! না, আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব মাধবের পক্ষে! অসম্ভব। সর্ব্বশরীরে কেমন যেন একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে মাধব—স্বাধীনতার স্বচ্ছন্দ্য—সমস্ত শিরা উপশিরায় পথ-ক্লান্ত শোণিতের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ—সারা মনপ্রাণে স্বাধীনতার দুর্ব্বার শক্তি! যে শক্তির বলে মাধব দরকার হলে ঐ নদীর জলে ডুবে মরে যেতে পারে—বিষ খেতে পারে, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেতে পারে। সে এখনো এতখানি স্বাধীন, এতখানি সক্ষম!—পুলিশের হেফাজতে গেলেই এ স্বাধীনতার সবটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। না,—না—কথাটা মাধব সজোরে উচ্চারণ করেলো, যেন অরণ্যানী, নদীস্রোত, মায় পাহাড় আর তার ওপারের চক্রবালরেখার উদ্দেশে জানিয়ে দিল তার সঙ্কল্প।

জায়গাটা অত্যন্ত নির্জ্জন—চারদিকে একবার তাকালো মাধব। আকাশের রং গাঢ় নীল—এক ফোঁটা মেঘের কালিমা নাই, একটা চিলের বিন্দু নাই—নদীর স্রোত তেমনি ফেনিলোচ্ছল—বনানী তেমনি স্তব্ধ। নৈঃশব্দের ভয়াল ভীষণতা যেন বিশ্বকে গ্রাস করেছে—অদ্ভুত, অপূর্ব্ব! শুধু একটা গম্ গম্ গম্ গম্—পরিপূর্ণতা!

ধরিত্রী যেন ধ্যানে বসেছেন, নটরাজ যেন গাল বাজিয়ে নৃত্য করছেন আপন আনন্দে, ব্যোম্‌ব্যোম্ ববব্যোম্!—মহাকাল যেন ধ্বংসের ভ্রূকুটি তুলে স্থির হয়ে গেছেন—একটা সকলভোলা প্রশান্তি যেন জড়িয়ে রয়েছে আকাশে বাতাসে।

ছেলেবেলায় ভূতের ভয় ছিল মাধবের খুবই, এমন কি, বড় হয়েও ছিল ভয়টা। কীর্ত্তনের দলে থাকাকালে শৈলীর ঠাট্টায় সে-ভয়টা কেটে গেছে, কিন্তু চোরের ভয় তার যায়গা জুড়ে বসেছিল! চোরের ভয়ও এখন আর নাই মাধবের, কিন্তু পুলিশের ভয়—সে যে ভয়ঙ্কর ভয়! "পুলিশ" কথাটা উচ্চারণ করতে ভয় করে। 'পুলিস' কথাটা পড়তে ভয় করে! "পুলিস"! সেদিন ট্রেণে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ে এক বন্ধুকে শোনাচ্ছিলেন, —"বড়বাজারে একটি গুদাম হইতে কলিকাতার পুলিশ চুশোমন চাউল—". আর শুনতে পারেনি মাধব, কাণে আঙুল দিয়েছিল, আর ভেবেছিল, মহা অলক্ষণ ঘটলো। ঐ খবরটা শোনার সঙ্গে তার ভাগ্যেও পুলিশের লাঞ্ছনা লেখা হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে মাধব দুর্গানাম জপ করেছিল সেদিন—বলেছিল—দুর্গা দুর্গা—দুর্গা নাম করলে নাকি বিপদ কেটে যায়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়েছিল, সে বৈষ্ণব-বংশজাত। দুর্গা শাক্তদের ঠাকুর। দুর্গা নাম করা তার ঠিক হয়নি; তৎক্ষণাৎ সংশোধন করবার জন্য নাক-কাণ মলে বলেছিল—"বিপত্তে মধুসূদন—"

ভয়—ভয় যে কি ভয়ঙ্কর, মাধব সেটা রোমে রোমে অনুভব করছে আজ। চোরের ভয় এমন কিছুই ভয় নয়—ভূতের ভয় তো ভালোই

লাগে ; সত্যি লাগে ভালো।—কিন্তু পুলিশের ভয়—বা গো! শৈলীর এতোটুকু ভয়ডর ছিল না—কতকি আজগুবি গল্প বলতো ভূতের—যখন বুঝতো মাধব বেশ ভয় পেয়েছে তখন চালাকী করে বলতো—"ভয় করছে মাধবদা, একা শুতে পারবো না আমি—"বলেই উঠে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খিল লাগিয়ে দিত। ভয়চাপা বুকে মাধব নিজের বিছানায় শুতো এসে—একা—নিরাশ্রয়। ভয়ভীতু মন ঘুমুতে পারতো না—আবার বাইরে গিয়ে কাউকে ডাকতেও সাহস হোত না! কত রাত মাধবের এমনি কেটেছে—অথচ—ভাবতে মাধব অন্তরে লাল হয়ে ওঠে—শৈলী কত রকমের ইঙ্গিত দিয়েছে—কত হাজারবার করে বলেছে মাধবকে যে একা সে শুতে পারে না—মাধব আসুক। কিন্তু নির্বোধ মাধব সেদিন একবারও সে কথা ভেবে দেখে নি—কিম্বা বুঝেও বোঝেনি। এতখানা আয়ত্তের মধ্যে যে-নারী এসেছিল, আকুতি জানিয়েছিল—আকাংখার আবিলতায় অন্তরের ঈর্ষাতুর করে তুলেছিল—মাধব তাকে একটা মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করলো না কখনো—একবার দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো না—একী ভয়ঙ্কর দুর্বলতা, ভীরুতা, ক্লীবত্ব মাধবের! পুরুষের জীবনে এর থেকে বড়ো লজ্জা, এর থেকে কদর্য্য গ্লানি আর কিছু নাই। গ্লানির কারণ, মাধব তো সাধু নয়—ব্রহ্মচারীও নয়! ঐ শৈলীকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে নেবার দুর্বার আকাংখার অন্ত ছিল না মাধবের মনে। রাত্রির অনিদ্রা তার ঐ শৈলীকে কল্পনা করেই মনোবিলাসে কেটেছে—স্বপ্নে ঐ শৈলীকেই নিবিড় আশ্লেষে নিষ্পিষ্ট করেছে, কিন্তু জাগরণে ঐ শৈলী—অত কাছে থেকেও শৈলী কেমন অছোঁয়া রয়ে গেল মাধবের আলিঙ্গন থেকে! কিন্তু কেন? কেন মাধব এমন নির্বোধ হয়েছিল?—আর একবার যদি সুযোগ পায় তো দেখে নেবে একবার—কিন্তু সুযোগ পাবার আর কোনো উপায় নাই। —শৈলী আজ পরপারে!

পরপারে শৈলী—কথাটা ভাবতেও ভয় করছে মাধবের। কিন্তু মাধবই

তাকে অবধার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। একটি মাত্র লাথি—তাতেই সব শেষ হয়ে গেল! যে দেহের একটু সান্নিধ্য লাভে মাধবের শিহরণ জাগতো, —যার মুখের দিকে তাকিয়ে মাধব ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করেছে, কথা বলেছে, কবিতা আওড়েছে তাকেই একটি লাথিতে শেষ করে দিয়ে এল! একবার ছুঁলো না, একটু আদর করলো না।

অত কাছাকাছি এসেও শৈলী কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যবধান রক্ষা করতো—বলতো—আমি বাপু বামুনের মেয়ে, অসতীপনা আমি করতে পারবো না। গান গাই, মাইনে পাই, তা'বলে কি ঐ কুসমীদের মতন যার তার সঙ্গে যা-তা ক'রতে হবে নাকি! ছিঃ, মাগো মা—লাজের গলায় দড়ি!

—কি তাহলে করবে তুমি? মাধব প্রশ্ন করতো।

—কি আবার! ঘরে ফিরে যাব! মা আছে, ভাই আছে। বিয়েও তো হতে পারে আমার!

—বিয়ে! মাধব বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে দিত চোখদুটো।

—হুঁ—কেনো! নয় কেনো! কাউকে কখনো ছুঁই নি আমি—যা-কিছু আমার মুখের কড়ি! কথাটা বলেই মাধবকে ধমক দিত, —এই, খবরদার মাধবদা, সরে বসো—মেয়েমানুষের গা ঘেঁষে অমনি বসতে আছে নাকি?—যাও সরে যাও—বলেই গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ কথাই বলতো না! মাধব ভাবতো, শৈলী হয়তো সত্যি বামুনের মেয়ে; সত্যি মা-ভাই আছে ওর এবং সত্যি ও আজো সতী। এতকাল এত রকমে মিশে এত কথা বলেও মাধব ধরতে পারে নি, শৈলী সতী কি অসতী—বারনারী কি বিবাহযোগ্যা কুমারী! অথচ মাধবের ধারণা ছিল, শৈলী খেমটাওয়ালী—শৈলীর চরিত্রহীনা হওয়াই স্বাভাবিক এবং ও হয়তো তাই; তবু মাধব সহজ করে একদিনও শৈলীকে একান্তভাবে আপনার করতে পারে নি। কারণ মনের মধ্যে একটা "হয়তো" একটা "কিন্তু" ছিল প্রকাণ্ড। এ ভুল মাধবের যেদিন ভাঙলো সেদিন শৈলী শুধু অন্তঃস্বত্ত্বাই নয়—নির্ব্বিকার

চিত্তে নিরীহ মাধবের চরিত্রে অপবাদ ঘোষণা করে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছে। উঃ! নারী কী নিদারুণ ছলনাময়ী! আচ্ছা প্রতিশোধটা নিল শৈলী! কিন্তু মাধবের দোষ কোথায়? শৈলী নিজেই তো নিজকে ব্রাহ্মণকন্যা বলে, বিবাহযোগ্যা বলে, সতী বলে প্রচার করতো। তার মুখের সব কথাগুলোই মাধব বান্ধবীর অকপট অন্তরের আনন্দদ্যোতনা বলে ভুল করেছিল; এখন বুঝতে পারে—"একা শুতে ভয় করে—" কথাটার মধ্যে কি অশান্ত ক্ষুধা লুকানো ছিল শৈলীর। কিন্তু বুঝে আর লাভ নাই।

শেষটায় শৈলী বিরক্ত হয়ে মাধবকে প্রায় এড়িয়ে চলতো; ঐ পালা-গানের লেখা শুনবার জন্য সকালবেলা হয়তো আসতো একবার—আর নয়। কতদিন বলেছে—তুমি আবার একটা মানুষ মাধবদা—বনমানুষের বুদ্ধি থাকে, তোমার নাই! তুমি করবে কীর্তনের দল! হুঁ!

—কেন? করতে পারবো না?

—পারবে! ভীতু। বৃহন্নলা! উত্তরাকে গান শিকোও গা, যাও! বলেই চলে গিয়েছিল শৈলী।

তারপরই ঐ কাণ্ড। এতটা কথা বলার পরেও মাধব তার পালাগান রচনায় বিভোর ছিল। মানুষের বুদ্ধি এত স্থূল হয়! হ্যাঁ, হয় বৈকি! নাহলে মাধব কি আর একলাই হয়েছে! অনেক মানুষ আছে যারা হাতের কাছের রঙিন সরবৎ ঠোঁটে তুলতে ভয় পায়—শুধু দেখে। ভাবে, বিষ আছে নাকি। খেয়ে দেখলেই পারে এক ঢোক। কিন্তু ভীতু যারা, তারা খেতে পারে না—মাধব সেই জাতের!

সব ভয়ই প্রায় কেটে গেছে মাধবের। পুলিশের ভয়, তাও কেটে যাবে একদিন কিন্তু নারী-মনের রহস্যগভীর ভীষণতা—তার আবেদনের আর অস্বীকারের অস্পষ্ট আশয়—ইঙ্গিত আর অনিচ্ছার সূক্ষ্মতম ব্যবধান-রেখা—মাধব হয়তো কোনোদিন ধরতে পারবে না। নারীকে সে ভালোবাসে

কিন্তু তার ভীষণ ভয়ালতাও মাধবের কাছে ভূতের ভয়ের চেয়ে কম নয়। এ ভয় কাটিয়ে উঠবার যে পন্থা—মাধব সেটা জানে—মনে মনে বহুবার জল্পনা করেছে, এ ভয় সে কাটিয়ে উঠবেই কিন্তু সেই দুর্গম পথে গমনের দুঃসাহস কোনোদিনই তার জাগেনি।

বিড়ি ধরালো মাধব একটা। নিদারুণ খিদে—খিদে ভুলবার এই একমাত্র ওষুধ—বিড়ি। কিন্তু তৃষ্ণাটা ভোলা যাচ্ছে না। বরং বিড়ির ধোঁয়ায় আরো শুকিয়ে উঠছে গলাটা। সমস্ত শরীরে রুক্ষতার আস্বাদ; মুখটা তেঁতো হয়ে উঠেছে—কপালটা দপ্‌দপ করছে। স্নান করলে মন্দ হয় না। ভাবামাত্রই মাধব বিড়িটা নিবিয়ে রেখে উঠে পড়ল। ঝোলা থেকে বার করলো ভাঁজকরা আলখেল্লা, তার সঙ্গে বই কখানা—কিন্তু খাতাটা কৈ? সেই খাতাটা! যাঃ, হারিয়ে ফেলেছে কোথায়! লক্ষ টাকার সম্পত্তি হারিয়েছে যেন মাধবের—এমনি ভাবে বসে পড়ল সে। কোথায় হারালো! সবই তো ছিল এই ঝোলার মধ্যে। চার পাঁচ দিন আগেও খাতাটা দেখেছে মাধব—নতুন একটা গানও লিখেছিল সেদিন। সবই আছে, আর খাতাটা নেই, এ কি ভাজগুবি ব্যাপার! শৈলীর হাতের কত লেখা, কত কাটাকুটি ছিল ঐ খাতাটায়। শৈলীই ওটা চুরি করলো নাকি? হবে! অপমৃত্যুতে মরা মানুষ ভূত হয়···শৈলীও হয়েছে, আর মাধবের কাছ থেকে তার শেষের স্মৃতিটুকু কেড়ে নিয়ে গেছে!

যাক্ গে! কি আর হবে! কি হবে আর ও খাতা নিয়ে! মাধব কি আর কোনোদিন দল গড়ে কীর্তন গাইতে পারবে! কিন্তু পারলে মন্দ হোত। দলের অধিকারী সেজে পুলিশের চোখে ধুলোও তো দিতে পারা যেত—নামটা দিত বদলে—মাধবদাসের বদলে নরোত্তম দাস—না—নাম না—দাস উপাধিই রাখা হবে না—শ্রীদাম অধিকারী কিম্বা সুবল বিবাজ, না হয়তো রাধামোহন রায়। ——— ——— ———

হ্যাঁ—রাধা মোহন না হয় রাধারমণ রায়—তিনটে 'র'। উত্তেজনায় আবার দাঁড়ালো মাধব। খাতাটা হারিয়েছে, যাক…আবার লিখে নেবে মাধব। অনেক গান মুখস্থ আছে সে-খাতার। তাছাড়া, এবার আরো ভালো আরো বেশি আদিরস দিয়ে লিখবে। ও খাতায় শৃঙ্গার রসটা ঠিকমত জমে নি; শৈলী খুঁৎখুঁৎ করতো। এবার জমিয়ে লিখবে! করুণ রসের বড্ড বাড়াবাড়ি হয়েছিল, এবার কিছু রুদ্র রস আর বিভৎস রস লাগাবে। ব্যজস্তুতি, অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারও দেবে।

মাধব ভাবতে ভাবতে নদীজলে নামলো গিয়ে। যতটা ঘোলা দেখাচ্ছিল জলটা তফাৎ থেকে, ততটা ঘোলা নয়! বেশ জল। গা ডুবিয়ে ভালো করে স্নান করলো মাধব! শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে যেন; কয়েক আঁজলা খেল জল; না খেয়ে পারা যায় না আর! ভারী মিষ্টি লাগছে, কিন্তু পেট খালি…বেশি খেল না!

উঠে এসে ভিজে আলখেল্লাটা গাছের ডালে শুকুতে দিয়ে মাধব ঝোলায় মাথা রেখে ঘাসের উপর শুলো। সুন্দর হাওয়া…ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে মধ্যাহ্নের স্তব্ধ বনানীর বুক কাঁপিয়ে। শ্রান্ত মাধব, স্বাধীন মাধব, লোকলোচনের বহিষ্কৃত নিশ্চিন্ত মাধব ঘুমিয়ে গেল।

পর পর তিনটে রাতের জাগা ঘুম ঘুমিয়ে মাধব যখন জাগলো, সূর্য তখন মালক পাহাড়ের আড়ালে নেমেছেন। বর্ষার বিকৃত দিনটা অবাধে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গোধূলির সোনালী আলোতে ঝিকমিক করছে নদীজল। শালগাছের মাথার পাতায় আলো, স্বর্ণলতায় লতামরীচিকা রহস্যের আবছায়া…আর একটা উড়ন্ত পাখীর "পিউ কাহা পিউ কাহা" স্বর মাধবের সদ্য জাগ্রত মনকে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রেখে দিল তার বর্তমান অবস্থার কথা; কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মাধব অবিলম্বে সচেতন হয়ে

কোথায় যাবে! কোন্ দিকে যাবে?…ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে মাধব আস্তে পা ফেলছে। সারা দিনের অনাহার…পথশ্রম…তবু যেতে হবে তাকে। হন্তে কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে…পথে, বনে, জঙ্গলে। অদৃষ্ট!

বনের দিকে এতবার সাহস নাই মাধবের…নদীর ওপারের দিকেও না। যে-পথে এসেছে সেই পথেই হাঁটছে। যাচ্ছে কোথায়? সুদাসের বাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না…না। কিন্তু সেই আধখানা চোখের মালিকটি, সেই যার শাড়ীখানা টেনে নিয়ে আত্মরক্ষা করেছে মাধব আজই, সেও কি মাধবকে তাড়িয়ে দেবে? হ্যাঁ, দেবে তাড়িয়ে—সেও শৈলীর জাত!

প্রত্যুষে দেখা মিলনের সেমিজপরা বিহ্বল মূর্তিটা মনে পড়ে গেল মাধবের।

…হাঁটছে!

সেদ্ধ পোড়া দিয়ে ভাত খেতে বসলো সুদাস। আলু সেদ্ধ, কচু সেদ্ধ, ধুঁধুল পোড়া—ঢেঁড়শ ভাজা—গরম ভাত, ঘি—আহা, অমৃত যেন! কাছে বসে আছে মিলন।

—মা আমার! মাছ ক'টা রাঁধলি নে যে!

—থাকগে বাবা, ভেজে রেখে দেব।

—খাবি কি দিয়ে মা?

—তুমি এই দিয়ে খেতে পারছো বাবা, আর আমি পারবো না!—পাখাটা জোরে চালাচ্ছে মিলন। সুদাসের চোখদুটি জলে ভিজে ভিজে—মিলনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

তুই আমার লক্ষ্মী প্রতীক; বুঝলি মা,—ঐ মূর্তি যেমন শ্রীভগবানের প্রতীক, তেমনি! তোকে বকিঝকি আবার তুই নাহলে যে একদণ্ড

—বকো নি তো বাবা! বকলে আমার মনে কিছু ব্যথা লাগতো না। আমার কিছু খারাপ দেখলে বকবে তুমি—ধমক দিও—চড়চাপড় দিও···মিলন বলতে বলতে কেঁদে ফেলল—কেঁদে ফেললো সুদাসও। মিলনের পিঠে বাঁ হাতখানা রেখে আস্তে বলল শুধু—কোল জোড়া মাণিক আমার!

নিজকে সামলে নিয়ে মিলন বলল—খাও বাবা, কিছু খাচ্ছ না—খেয়ে নাও!

—খাই। সুদাস শেষ করে দিল খাওয়া। মিলনের হাত থেকে ফুদেওয়া কলকেটা নিয়ে বলল—যা, খেয়ে নে। খাওয়ার পরে আমাকে একছেদ পুঁথী শোনাবি—যা—!

—যাই!—মিলন রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে। সুদাস বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাক টানলো কিছুক্ষণ, ক্লান্তি লাগছে। পঁচিশ বছর আগের মত পরিশ্রম করেছে আজ সুদাস—তারো বেশি! ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায়। স্নেহের নির্ঝর বুকটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে! মিলন হয়তো পুঁথী শোনাবার জন্য খাওয়াটায় তাড়া করবে—ভালো করে খাবে না—হয়তো খেয়েই ছুটে আসবে এখানে। মাথার পাকা চুলে হাত বুলোবে, নয়তো কপালের ভাঁজগুলো গুণবে, বলবে, 'পাচটা ভাঁজ ছিল বাবা, আজ আবার ছটা হয়েছে; তুমি কাহিল হয়ে যাচ্ছো বাবা···।' করুণ দুটি আশ্রয়-প্রার্থী চোখ তুলে তাকিয়ে থাকবে। ছেলে মানুষী! সবটাই ছেলেমী মিলনের। কপালে ভাঁজ পড়বে না তো কি ওর মতন মসৃণ থাকবে! সমাধী-শয়নে শোবার দিন এল সুদাসের। চির-সমাধি—হ্যাঁ; কিন্তু মিলনকে কোথায় রেখে যাবে সুদাস? কার কাছে! সুদাস না থাকলে মাধব বা মাধবের মত অনেকেই যে মিলনের দেহকন্দ লুণ্ঠন করতে আসবে। না···রক্ষক একজনকে নিযুক্ত করে যাবেই সুদাস! কন্ঠীবদলটাই করিয়ে যেবে। কিন্তু কার সঙ্গে? মাধবের সঙ্গে? অসম্ভব! ও খুনী। কিন্তু

আর তো কারো কথা মনে পড়ে না! কিশোরকে ডাকলে কেমন হয়। নন্দ কিশোরকে!

নন্দকিশোর সুদাসের দূর সম্পর্কের ভাইপো—বাড়ী কাঁকরতলা। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ ছেলে। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। লেখা পড়া ভালো শেখে নি, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমন্ত, ঐটুকু বয়সেই কেমন গুছিয়ে ব্যবসা করছে। হাটে-মেলায় দোকান দেয়, বেশ দুপয়সা কামায়, তা ছাড়া ছেলেটা ভালো বংশের। স্বভাবচরিত্রও মন্দ বলে মনে হয় না। ওকেই দেখা যাক।

প্রথা যখন রয়েছে, তখন আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি! বয়স বেড়েছে, বুঝেছে মিলন এখন নারী-জীবনের রহস্য। দার্শনিক মত দিয়ে বা আধ্যাত্মিক কথা শুনিয়ে ওকে আর নিরস্ত করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক কথা অনেক শুনিয়েছে ওকে সুদাস। শ্রীভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীপদকল্পতরু, কত কি পড়ালো। কতো ভাব, কত তত্ত্বকথা দিয়ে মিলনের মনকে সুদাস এই দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রাখতে চেয়েছে—কিন্তু কি হোল! মানুষের মন মানুষেরই মত হবে। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান মানবদেহ ধারণ করেছিলেন, তাই রাস-বিলাস তাঁকে রাখতে হোল। তাঁর মানবদেহত্বের প্রমাণ রাখতে হোলো মহারাজা করে।

স্বয়ং ভগবানও নরদেহের আকাঙ্ক্ষা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি! মিলন তো সাধারণ একটা মেয়ে। সুদাসই কি পেরেছে—কেউ কি পারে কখনো!

নিজের যৌবনের দিনগুলো মনে পড়ল সুদাসের। বহুদিন গেছে বিগত হয়ে- বিগত হয়ে গেছে যৌবন—বিস্মৃত প্রায় সে দিনের কাহিনী, তবু সুদাস আজো রোমন্থন করে সেই ভোগের চিন্তাগুলি ··সময় পেলেই করে। শ্রীরাধার মান, বিরহ, মিলনরস যে অতখানি মধুর মনে হয়—তার কারণ তো ঐ ভোগের স্মৃতি, নইলে শ্রীনন্দ কিশোরের নাপিতানী বেশ, জলকেলী, রাস-বিলাস কি এমন করে অনুভব করা যেত! পত্নীবিয়োগের পর ধর্মের মধ্যে ডুব গিয়েছিল সুদাস—আর মকর লালন-পালনে। মক

সুদাসের শেষ বয়সের সন্তান—তাই এতো বেশি মায়া পড়েছিল তার ওপর। বিয়ে করলে পাছে সৎমা তাকে কষ্ট দেয়···এই জন্যই তো সুদাস—হ্যাঁ, এই জন্যেই নরু আর শ্রীগৌরাঙ্গকে নিয়েই যেতে রইল !—তা থাক—কেটে গেছে এক রকম করে। এখন মিলনের একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলেই সুদাস নিশ্চিন্তে মহাসমাধিতে বসতে পারে !

পাশ ফিরে শুলো সুদাস—মিলন হয়তো খাচ্ছে, হয়তো ভাবছে—কার কথা ভাবছে ? সুদাসের কথা ? না, মাধবের কথা !···মাধবের কথাই ভাবছ হয়ত !

—মিলন ?

—বাবা ! মিলন ওঘর থেকে সাড়া দিল। সুদাস আওয়াজে বুঝলো, মিলন খাচ্ছে—তাড়াতাড়ি করো' না মা, বসে বসে খাও। পুঁথী ওবেলা শুনবো ! সুদাস কথাটা বলে চোখ বুজলো।

মিলন আর কিছু উত্তর দিল না। সুদাস আবার চিৎ হয়ে শুলো। নরুর আত্মার অপমান হবে, কিন্তু নরুর আত্মা কি আর বসে আছে এখানে ! মৃত মানুষের আবার মান অপমান কি ! নরুর আত্মার অপমান নয়, সুদাসের আভিজাত্যের অপমান, সেইটাই সুদাস বরদাস্ত করতে পারছে না। আপনার বংশগৌরবকে সুদাস ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না—আপনার দেওয়া শিক্ষাকে সুদাস অ-সফল দেখতে চায় না—নরুর অপমানের জন্য নয়, সুদাসের নিজের নানারকম অসম্মানের জন্যই সুদাস চায় না মিলনের কণ্ঠীবদল করিয়ে দিতে।

সুদাসের দার্শনিক মন নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চাইছে—কিন্তু ঐ দার্শনিক মনই বলে দিল—তার দেওয়া শিক্ষা, আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান সফল হয়নি। মিলনের মধ্যে তার বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয় এবং তার আভিজাত্য একদিন লাঞ্ছিত হবেই ! তার চেয়ে মানে-মানে মিলনের কণ্ঠীবদল করিয়ে দিলে সব দিক বজায় থাকে ! লোকে বলবে—শুভ্র

একটা গতি করে দিল বৌটার। নাহলে সুদাস মরলেই মিলনের বাবা এসে তাকে নিয়ে যাবে এবং যা করবার করবে—বিয়ে দেবে।

সুন্দর মেয়ে—অল্প সুন্দর নয়—যে দেখে সেই প্রশংসা করে; কাজেই বিয়ে তার হবেই। আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে আজকাল। কাল সন্ধ্যায় যখন চুলবেঁধে কাপড় পরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে গেল—আহা, কি চমৎকার দেখাচ্ছিল! হতভাগা নরু—অকালে চলে গেল; দেখলো না, দেখতে পেল না ঐ রূপ একটা দিনও; কোনোদিনই নরু ওকে দেখেনি বোধ হয় দেখলো কখন? দেখবার বয়সই হয় নি! মিলন তো কার্য্যতঃ কুমারীই ছিল, কুমারীই আছে—নাঃ আর নেই…গত কাল…

মাথাটা বালিশে একবার ঠুকে নিল সুদাস—ব্যথা করছিল যেন। যেন ললাটের রেখাগুলো চড়চড় করছিল। হাত বুলুলো একবার লোলচর্ম, শিথিল মাংস,—গায়ের ঢিলে গেঞ্জির মত উঠে আসছে—নারায়ণ, মধুসূদন পার কর প্রভু!

শুনতে পেল মিলন ওঘর থেকে! সুদাস জোরে জোরে ঠাকুর নাম করে। থালাবাটিগুলো গুছিয়ে রেখে হাত ধুলো! মনটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে ওর। একটা দারুণ অপকলংক থেকে ও নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে।—সুদাস কোনো প্রশ্নই করলো না…কেন করলো না, কে জানে! মিলন বলতেই চেয়েছিল, কিন্তু সুদাস থামিয়ে দিয়েছে, বলেছে…তুই আমার মা—কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কিছু। ছেলের কাছে মা আবার কি কৈফিয়ৎ দেবে। যা—খা গিয়ে।

আশ্চর্য্য এই শ্বশুর। এতো স্নেহশীল। শ্রীনন্দ বোধহয় শ্রীগোপালকে এমনি স্নেহ করতেন। না হলে শ্রীগোপালের সমস্ত অত্যাচার, তার নামে অপবাদ, কলংক সয়ে যেতেন কি করে শ্রীনন্দ মহারাজ! তাঁর শ্রীগোপাল তো সত্যিই দুষ্ট ছিল তবু তিনি সয়ে যেতেন—আর মিলন। মিলন তো নরপরাধ! কৈফিয়ৎ দেবার কি আছে তার! শ্বশুর তাকে চেনে। সে

শ্বশুরের শিক্ষায় প্রজ্ঞা লাভ করেছে। তুচ্ছ দৈহিক আকাঙ্ক্ষার থেকে পরমার্থিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে অনেক বেশি একথা জানে শ্বশুর। সকালে ওঁর বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল হয়তো! কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করলো না? একবার শুধুলেই মিলন বলতে পারতো রাত্রের কথাটা, ভোরের অবস্থা-বিপর্যায়ের কথাও। শুধুলো না কেন! বলতেই বা দিল না কেন! যদি কিছু খারাপ কাজের কথাই স্বীকার করে মিলন—এই ভেবে? হবে। হবে—চরিত্রহীনা হবে—এ কল্পনা সুদাস সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু মিলন তো সত্যি খারাপ হয় নি! হয় নি খারাপ, হবে না! নিজকে সে নিষ্ঠুর শাসনে বন্দী করবে, প্রয়োজন হলে নিগৃহীত করবে—এই কথাটা জানিয়ে দিতে হবে সুদাসকে। জানিয়ে দিতে হবে—গতরাত্রে মিলনের তিলমাত্র অধঃপতন ঘটে নি। মিলন এখনো তেমনি অকলঙ্কিতা, অনাঘ্রাত রয়েছে।

হাত ধুয়ে মিলন মুখে একটুকরো হর্ত্তুকি ফেলে দিল—মুখটা খুবই খারাপ দেখায়—হর্ত্তুকির কষ ঠোঁটে লেগে দাঁতমুখ বিশ্রী দেখায়! কিন্তু কে দেখছে! মাধব তো আর আসছে না—মিলনেরও আয়না নাই। আর কেউ নাই দেখবার। হর্ত্তুকির টুকরোটা চিবুতে চিবুতে মিলন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করলো—শুকনো চুল এলানো ছিল—বেঁধে নিলো লোটন খোঁপায়, কাপড়টা বেশ করে গুছিয়ে পরলো, তারপর এসে দাঁড়ালো সুদাসের ঘরের দরজায়।

সুদাস ঘুমিয়ে গেছে। ভারী নিশ্বাস পড়ছে। তাহলে এখন আর বলা হোল না কিছু। থাক, বিকালেই বলা যাবে। কিন্তু বিকাল তো হয়েই এল। আর কতটুকু বেলা আছে? আচ্ছা, উঠুক—মিলন বলবে, বলবে যে তার কিছু দোষ নাই!

ও-ঘরে আর ঢুকলো না মিলন। ঠোঁটের কষায় রসটা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে ঢোক গিললো! তার পর নিজের ঘরে এসে শুলো। বালিশের

তুলায় রাখা বইটা মাথায় লাগছে। টেনে বার করে দেখলো—বিদ্যাসুন্দর। কয়েকপাতা পড়ে গেল। এক যায়গায় লেখা—

"কহে একজন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন মাঝে,
দিয়েছে আনিয়া সোহাগে গড়িয়া
হারে মিলাইয়া পড়িতে সাজে—"

কী চমৎকার! অর্থটা অনুভব করলো মিলন। অলঙ্কারের গৌরব, ছন্দের ঝঙ্কার, ভাষার পারিপাট্যও। সুন্দর-সুন্দর বইখানি! গতরাত্রে মাধবের খাতাখানায় ভাষা, অলঙ্কার, উপমার রাশিরাশি ভুল পড়ে মিলনের বিদুষী মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। আজ শ্রীভগবান পড়বার মত একখানা বই দিয়েছেন! কতো রকম ছন্দ, কতো রকম অলঙ্কার—কতো আশ্চর্য্য উপমা! অনেক কথার মানে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না—তাতে কি যায় আসে! বইখানা আশ্চর্য্য সুন্দর মনে হোল মিলনের। পড়ে চললো।

রাতজাগা মস্তিষ্ক—ঘুমিয়ে নিতে পারলে একটু ভালো হোত। কিন্তু এই বই শেষ না করে কি ঘুমানো যায়! মালিনীর রূপের বর্ণনা পড়তে পড়তে মিলন হেসেছে আর বিস্মিত হয়েছে—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম,
দাত ছোলা মাজা দোলা হাস্ত অবিরাম"

—হিঃ হিঃ হিঃ হাসছে মিলন। আবার পড়তে পড়তে গেল—

কড়ি ফটকা চিঁড়া দৈ, বন্ধু নাহি কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে···বাঃ চমৎকার।

আবার পড়ল—

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে—অপরূপ।

পাতার পর পাতা পড়ে চললো মিলন। আদি রস, শৃঙ্গার রস—করুণ, রৌদ্র, বীভৎস—কতরকম রসসৃষ্টি করেছেন কবি! কতো অনুপম উপমা

অলঙ্কার ! ধন্য, ধন্য এই কবি ভারতচন্দ্র। মিলনের রসগ্রাহী অন্তর সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাচ্ছে কবিকে—শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠলো মন ওর।

চমৎকার ! কত ছন্দ ! পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, মল্লঝাঁপ, তোটক কতো রকমের ছন্দ ! কতোই না অলঙ্কার ! অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, যমক—আহা ! মিলনের মনটা কাব্যের সুষমায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। জোরে জোরে পড়তে ইচ্ছে করছে—কিন্তু বইটায় কালীর নাম রয়েছে। বৈষ্ণবঘরে কালীর নাম, এমন কি 'কাটা বা পাঁটা কথাটাও উচ্চারণ করতে নিষিদ্ধ—শ্বশুর যদি জানতে পারেন ! না—সুদাসকে মিলন আর ব্যথা দেবে না। কিন্তু একটা কবিতা আরম্ভ করেছে মিলন—আহা, কি সুন্দর তোটকছন্দ !

"নৃপনন্দন কাম রসে রসিয়া
পরিধানধুতি পড়িছে খসিয়া"

—মিলন !

—যাই বাবা—বইটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি মিলন খাটের নীচে গুঁজে রাখলো। এখন আর পড়া হোল না। ভাল একটা ছন্দ—সেইটাই পড়তে পেল না মিলন। মনটা যেন বঞ্চনার বেদনায় আর্ত্ত হয়ে উঠলো ! কাপড়-চোপড় ঠিক করে সামনে এসে দেখলো—সুদাস উঠে এসে ঘটির জলে হাতমুখ ধুচ্ছে। মিলন তামাক সাজতে বসলো ! হুঁকোটা হাতে নিয়ে সুদাস বললো—আমি একবার গৌরের বাবার কাছে যাবো মা—বেলা পড়ে এল। গা ধুয়ে আয় তুই ; তারপর যাব আমি। এসে আবৃত্তি করবো !

মিলন নিঃশব্দে কলকেটা সুদাসের হাতে তুলে দিয়ে গামছা আর কলসী নিয়ে বেরুলো। গৌরের বাবার কাছে কি জন্যে যাবে সুদাস ? টাকা-কড়ি কিছু ধার করবে নাকি ? না—টাকাতো আছে। দিন চলে যাচ্ছে কোনো রকমে। মিলন ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে। গৌরের মুখখানা দু' একবার দেখেছে মিলন—ভারী সুন্দর দেখতে। আসতো যখন নরু বেঁচে

ছিল! একসঙ্গে পড়তো দুজনায়। কত যে মাখামাখি দুজনায় উঠোনে! মনে আছে মিলনের অক্ষর। সুন্দর দেখতে ছেলেটা। ঐ যেমন বইয়ে পড়ল না এখনি—হলদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া…

যেয়েছে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥

ঠিক ঐ রকম। গৌরাঙ্গ নাম ওর সার্থক হয়েছে। আজকাল আসে না। যদি আসে তো শুধু বন্ধুর বাপের খবর নিতে। কলকাতা থেকে ফিরেই আসবে, সদর থেকে খিড়কির পর্যন্ত আসতে আসতে বলবে…প্রণাম জেঠা!…শরীর ভালো জেঠা? আবার সুদাসকে সান্ত্বনা দিতে বলে, নরুর বদলে আমি আছি জেঠা। হুঁ—নরুর বদলে উনি আছেন? তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! কেউ কারো বদলে থাকে না বাপু! নরুর বদলে উনি এলে মিলন তো বর্তে যেত! বামুনের ছেলে—মনটা খুব উঁচু—মৃত বন্ধুর বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। মিলনের পানে ফিরে তাকিয়েছে কোনো দিন? হুঁ! একবার মনে আছে, গৌর এসে ডাকলো —দাস জেঠা!—মিলনের কাছ অবধি এলো! সুদাস বাড়ী ছিল না —মিলন তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল পেতে দিতে গেল বসবার জন্ত।

—জেঠা বাড়ী নাই বুঝি? আচ্ছা, আমি আবার আসবো—বলেই চম্পট! এই তো মাস চার পাঁচ আগের কথা! বেশ মনে আছে মিলনের। একবার ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। কেন বাপু? একটু বসলেইবা কি তোমার ক্ষতিটা হত! জেঠা ছিল না··মিলন তো ছিল। অনাদর ও কিছু করে নি তোমার। জেঠাকে দেখতে আস, আর বন্ধুর বৌএর একটু খোঁজ নেবে না! হুঁ…ভারী বন্ধু!…অভিমান হচ্ছে মিলনের; মিলনের ঘরে একটু বসলে যেন গৌর-এর জাত যেতো! অন্য দিন তো বলে, সুদাস থাকলে বসে থাকে অনেকক্ষণ। একা ঘরে ডাগর মেয়ে—তাই বসলো না। লোকে কলঙ্ক দেবে ভেবে বসে নি! কলঙ্ক দিলেই হোল কি না অমনি? গৌর জেলখাটা ছেলে—ওর নামে কলঙ্ক দিতে

কারো সাহস নাই। স্বদেশী করে জেলে গেছে কতবার। ভালো ছেলে, চরিত্রবান ছেলে। তাই! হুঁ! অত ভালো আবার হয়? অত ভালো হওয়া কিন্তুক ভালো নয় বাপু! একবার তাকায় না। মিলন যেন দেখতে অতি কুচ্ছিৎ!

অভিমানটা আরো বাড়ছে মিলনের। ঘাটে গিয়ে কলসীটা ঢিপ করে নামিয়ে দিল! গৌরের উপরেই যেন রাগ করে নামালো—সবাই অমনি, সবাই। সেদিন যদি গৌর একটু বসতো—একটা কথা বলতো কিছু মিলনকে—ভাগবত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। ভীতু সব—ওরা ব্যাটাছেলে! ঐতো—ঐতো পড়ছিল এখনি সুন্দরের কথা···বাপ স, কী সাহস! রাজার ছেলে,—দূর দেশে এল, মালিনীর সঙ্গে ভাব করলো, সুড়ঙ্গ কেটে গেল রাজবাড়ীতে—তারপর বিদ্যার সঙ্গে সে কত কথা! কত রকমের রসিকতা—কি পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধির ধার! ও বুঝি খারাপ লোক—না! ও কিছু খারাপ লোক নয়—খুবই ভালো লোক। গৌর যদি অমন হোত! কিন্তু হয় না—যার কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না।—নিরাশার অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে মিলনের মুখে। গা মেজে ভিজে কাপড়ে কলসীটা জলে ডুবিয়ে নিল মিলন—গৌর কী বাড়ী এসেছে? যদি একটিবার আসে—কত দিন দেখে নি গৌরকে। লোকে কুৎসা রটাবে —তাই জন্তেই আসে না গৌর, এলেও বসে না—কাঁকে কলসীটা নিয়ে ক্লান্ত চলতে চলতে মিলন ভাবছে—কুৎসা, কলঙ্ক! হুঁ। রটাবে তো রটাবে, কি বয়ে যাবে! গৌরকে জড়িয়ে মিলনের নামে কলঙ্ক, সে তো মিলনের ভাগ্যের কথা—যেমন শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে রাধার কলঙ্ক রাধার পরম ভাগ্যের পরিচায়ক! লোকে বলবে বন্ধুর বৌটাকে নিয়ে গৌর··· না-না-না, লোকে কিছু বলবে না। কিছু বলবারও সুযোগ দেবার ছেলে নয় গৌর! উদার, মহাপ্রাণ, দেশসেবক—মস্ত পণ্ডিত, আশ্চর্য্য বুদ্ধি—কিন্তু ভীরু—সামান্ত কুৎসাকেও ওর এতো ভয় যে, মিলনের দেওয়া

কম্বলটায় একটু বসতে সাহস পেল না। ও তো শ্রীকৃষ্ণ নয়, বিদ্যার সুন্দরও নয়। ও গৌর, শ্রীগৌরাঙ্গ, নিজের বৌকে রাজপুরে 'ভুযাও' বোলে যিনি পালিয়ে যান—বারবার আবেদনের উত্তরে বলে পাঠান—দেখা করতে পারবেন না—সন্ন্যাসে বাধে। সন্ন্যাস, হুঁ! বিশ্বজোড়া নাম বিলিয়ে নিজের নাম কিনে গেলেন—পূজো পাচ্ছেন খুব। জগাই-মাধাইএর জন্য তাঁর চোখে জল আসে—আর বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্যে! ঐ ঠাকুরকে—ঐ নারী-ত্যাগী ঠাকুরকে মালা পরায় মিলন রোজ! কাল সারাটা রাত ওর পায়ের কাছে পড়েছিল। কৈ—একবার হাতটা না হোক—পা দিয়েও তো মিলনকে ছুঁলেন না—নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন যিনি, তিনি আবার···

আহা, ছিঃ! কী সব ভাবছে মিলন! শ্রীগৌরাঙ্গ যে তার গৃহ দেবতা! সুদাস যদি জানতে পারে মিলনের মনের কথা তা'হলে—তাহলে কেটেই ফেলবে মিলনকে। আহাঃ—জিভ কাটলো মিলন দাঁত দিয়ে। 'কাটা' কথাটা ও উচ্চারণ করে ফেলেছে মনে মনে। নিষিদ্ধ—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বারণ ও কথা বলতে!

সদর খোলা। করবী গাছটার কাছেই ঝিং-এর লতায় হলুদের বান ডেকেছে একেবারে। সন্ধ্যা হয়ে এল—কিন্তু কে? কে ঐ লতার বড় বড় পাতার আড়ালে!—হাঁউ-মাউ-খাউ! নরুর ভূত নাকি?

সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মিলনের। ভয়ে বুক দুর-দুর করছে। কলসীটা সামলে না নিলে পড়ে যেত! মিলন পিছুচ্ছে—রাস্তায় গিয়ে পড়বে। এখনি সে শ্রীগৌরাঙ্গের নিন্দা করছিল—তিনি মিলনকে ত্যাগ করলেন নাকি! সেই সুযোগে নরু আবার চড় কষে দিতে আসছে না তো? কাঁপছে মিলন ভয়ে!

···ছিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ···এতো ভরুক তু বৌদি! মাগোমা! কুথা যাচ্ছালো, এখনো বিলা রইছে।

মুখ পুড়ি কোথাকার ! মরবার আর যায়গা পাইনি—না !—হন হন করে চলে গেল মিলন ঘরের মধ্যে।

—না-তাই তোর গলায় দড়ি দিয়ে মরতে আলোম—বুঝলি ! রাধাও সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকলো ! কলসীটা রেখে মিলন শুকনো কাপড় পরতে পরতে বলল—আর একটু হলেই পড়ে যেতুম ! জানিস !

—যেতিস ! অত তড়বড় হোস কেনে ! শুন ! জেঠা গেল গৌরদার বাবার সঙ্গে দেখা করতে ! বলল,—আমি যতক্ষণ না আসি মা, বৌমার কাছে থাক—তা আমারই বা কাজ কি ! মা-বৌদিরা কিছুই করতে দেয় না বলে কদিন বা থাকবি। খা' দা বেড়া—ঘুমো। কবে আবার যাবি চলে !—শশুর ঘর থেকে বাপের ঘর এল খুব খাতির হয় বৌ।

—হুঁ—মিলন গম্ভীর স্বরে বললে—ধূপ দীপ ঠিক করলো। সমাধি আর মন্দিরে সন্ধ্যার প্রদীপ দিল। ঠাকুরের কাছে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে ক্ষমা চাইল তার বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য—বললো…আমি পাপী তাপী নারী প্রভু—ক্ষমা করো—কত কি বলে ফেলি !

এতক্ষণে অবসর হোল মিলনের। দিনে শশুরের ভাল খাওয়া হয়নি—রান্নার আয়োজন করবে।

চা একটুন কর্ না বৌদি—আছে চা ? আমি ওখেনে রোজ খাই। এখানে কেউ খায় না কি না ;…

—করি ! গত কালের জমানো চা আর চিনি আছে, মিলন চা তৈরী করছে, রাধা শশুর ঘরের কথা বলে চলেছে এক কাহন কথা পাঁচকাহন করে। ভালো লাগছে না মিলনের। এক কথা কতবার করে শুনবে ও ? কিন্তু বিরক্তিটা মুখে জানাতে পারে না। শশুর বাড়ীর কথা সব মেয়েই বলে—শুনতেও হয়। অভাগী মিলনের বলবার মত নাই কিছু—তা'বলে কি আর কেউ বলবে না ! কিন্তু চা খেয়েই রাধা চলে যাক্—তাহলে

সেই তোটক ছন্দটা পড়তে পারে মিলন। মনটা ওর শোকাতুর হয়ে আছে! "নৃপ-নন্দন কামরসে রসিয়া-পরিধান ধুতি···

—কি বৌদি! কি বলছিস?—অন্যমনস্ক মিলন আবৃত্তি করে ফেলেছে স্বচ্ছ কণ্ঠে।

—একখানা বই পড়ছিলাম, ভারী সুন্দর—সবটা পড়া হয়নি—এমন মজার গল্প ভাই ঠাকুরঝি!

—বল না বৌদি শুনি!

চা ছেঁকে বাটিতে ঢালতে ঢালতে মিলন একটু ভেবে নিল—তারপর বিদ্যাসুন্দরের গল্পটা যতটুকু পড়েছে, মুখে মুখে বলে গেল রাধাকে, চা খেতে খেতে। রাধা জিদ ধরলো,—তোর পায়ে পড়ি, বৌদি, শোনা আমাকে!

—দূর! ও তুই বুঝবি না। খুব শক্ত শক্ত কথা আছে! পণ্ডিত লোকের লেখা!

—তা হোক—তুই বুঝিয়ে দিবি! মাইরী বলছি, আমি কাথখুকে বলবো না!

রাধা পড়তে পারে না ভালো। মিলন ভাবতে লাগল, রাধার কাছে বইটা পড়া উচিত হবে কি না। অনুচিত এমন কিছু হবে না—শুধু 'কালী' আর 'কাটা' কথাগুলো বাদ দিলেই হবে। ভাতের জলে চাল ফেলে দিয়ে মিলন মুখখানা মুছলো—রাধা ওকে সেই টিপটি পরিয়ে দিল আজ আবার—কবরী বাঁধতে আরম্ভ করলো এলো চুলে—বললো,

—পড় বৌদি—পড়! শুনি একটুন।

পড়বার ইচ্ছে মিলনেরও কম নয়। বইখানা বার করে এনে মিলন সদরে খিল দিয়ে এল। সুদাস এসে ডাকলে গিয়ে খুলে দেবে। রান্নাঘরেই আরম্ভ করলো পড়তে—সেই তোটক ছন্দটা—"বিহারারম্ভ" —অদ্ভুত সুরে পড়ে চলেছে মিলন।

অদ্ভুত ছন্দ—আশ্চর্য্য অলঙ্কার—মণিমুক্তা ছড়াছড়ি যাচ্ছে যেন। মিলনের কাব্যরস-পিপাসু অন্তর ভাষার লালিত্য, ভাবের ব্যঞ্জনা আর অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে আত্মহারা; তার কুমারী মন, তার উচ্চ শিক্ষিত ভাবকল্পনা, তার অনাঘ্রাত স্নেহযমুনা উচ্চতর আবেদনে উজান বয়ে চলেছে—সেখানে পার্থিব কামনার প্রত্যক্ষ পরশ লাভ আজো ঘটেনি। তার অবচেতন মনের অননুভূত রহস্য ধীরে ধীরে চেতনায় আসছে কিন্তু অভিভূত হয়ে যাচ্ছে চেতন মনের আধ্যাত্মিকতায়,—মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তরের ভোগবিরত ক্লিবতায়! তবু একটা অনাস্বাদিত নব রস অনুভব করছে মিলন।

কিন্তু রাধার কাছে ঐ শৃঙ্গার রসের দৈহিক আবেদনের কিছুমাত্র অজানা নেই!

—থাম্ বৌদি—থাম্—বাপ্। গা-হাত ঝি-ঝি করে এল! সারারাত ঘুম হবে না আমার আজ!

বাধা পেয়ে থেমে গেল মিলন। দুঃখের সঙ্গে বললো—ঘুম হবে না কেনলো?

—কেনে! তুই কিছু বুঝিস না বৌদি। বয়সে কুড়ি কিন্তুক কাজে তুই বারো পেরুস নাই। হিঃ হিঃ হিঃ।

এই ধিক্কারটা যেন প্রাপ্য মিলনের—ঠিক এমনি চোখে চাইল সে রাধার পানে! বয়সে কুড়ি হয়েও মনে বারো থাকার জন্য অপরাধটা যেন তার ক্ষমার অযোগ্য! মিলনের নিজেরই মনে হচ্ছে এই রকম! রাধা হাসছে খুবই, কিন্তু শব্দ করছে না—ওর সর্ব্বাঙ্গ হাসির ধমকে নেচে নেচে উঠচে—বিশেষ করে বুকের ছাতিটা। উন্নত, মাংসল বুক যেন তরঙ্গায়িত হচ্ছে রাধার। বললো—বাপ্—কি বই! কুথা পেলি বৌদি?

মিলন চুপ করে রইল—মুখে তার একটু হাসি ছিল—তাও গেল মিলিয়ে। কোথায় পেল সেকথা ও জানাবে না কাউকে। বইখানা বন্ধ

করে উঠে বলল—যাঃ ফাজিল কুথাকার! ঠাকুর দেবতার কথা নিয়ে হাসাহাসি!—মিলন চলে যাচ্ছে ওঘরে—আঁচল ধরে রাধা বলল—ঠাকুর দেবতা! ও বাবা লো! তা হোক না ঠাকুর! অমন আবার লিখে নাকি! বলে সেই—নিজের বিলা লিলেখেলা পাপ লিখেছ পরের বেলা—ঠাকুর দেবতা! হুঁ!

—বস—বস, শুনে যাই। ই জিনিষ শুনতে পাব কুথা! পড়—টেনে বসিয়ে দিল মিলনকে।

—বুঝতে পারছিস না—হাসছিস খালি!—মিলন রাগ করে বললো।

—বুঝতে তুই পারিস না—হাবা মেয়ে—বলেই রাধা ব্যাখ্যা আরম্ভ করে দিল—সম্পূর্ণ দৈহিক—আধ্যাত্মিকতার কোনো বালাই নাই সে ব্যাখ্যায়। অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষা, অজানা সব অঙ্গভঙ্গী—অনাস্বাদিত এক অমার্জিত সুখের শিহরণ! মিলন পড়ে—রাধা ব্যাখ্যা করে—যে কথার মানে জানে না—তা শুধিয়ে নেয় মিলনকে—বলে, কুচ হেমঘটে হেমঘট মানে কি লো! মিলন বলে হেম মানে সোনা…আর ঘট মানে ভাঁড়…। হেসে লুটোপুটি খায় রাধা, বলে, ওম্মা, সোনার ভাঁড়…বাঃ বেশ বলেছেতো…মাথা আছে ভাই!

পরবর্ত্তি পরিচ্ছেদ 'বিহার'…পড়া চলতে লাগলো…ব্যাখ্যাও। মিলন যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে…গলাটা কাঁপছে, হাত পাও! দুর্দান্ত একটা আবেগ, একটা ঝড়, একটা কাল বৈশাখী মাতামাতি করছে যেন বুকে…সুদাস ডাক দিল,

…মা…মিলন!

—যাই…বইখানা ঐ রান্নাঘরেই লুকিয়ে রেখে মিলন দরজা খুলতে গেল। তখনো কাঁপছে। বিদ্যাপতির কবিতা মনে এল…

…রাধা চলে গেছে নাকি রে মা ?

…না বাবা, আছে !

…বেশ। আমি ভাবছিলাম, তুই একলা থাকবি। ভয় পেতে পারিস !

জ্যোৎস্নার আলোতে তাকালো সুদাস মিলনের পানে। কপালের টিপ্ চিকমিক করছে। চুলগুলোও চিকচিকে, দু'একটা এসে পড়েছে গালে ! কানে দুল নেই…গলায় নেই হার…কীইবা আছে !…সুদাস নিশ্বাস ফেললো একটা।

মিলন আবার রান্না ঘরে এলো।

—রাধা বলল…আজ আর হবে না…নালো বৌদি !

…না ! মিলন নিজেকে সম্বৃত করতে চাইছে প্রাণপণে। ওর সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা উত্তাপ, যেন জালা…যেন হরকোপানলে দগ্ধিভূত মদনের পুষ্প ধনু ও…ও যেন সোহাগা মেশানো বাটিতে রাখা সোনা…আগুনের উত্তাপে গলে যাচ্ছে…গড়িয়ে যাচ্ছে কোথায় ! মনে পড়লো—"শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য"…হ্যাঁ, মানুষই সত্য। সত্য এই দেহ… এই দৈহিক দুর্ব্বলতা…এই ক্ষুধা, এই গলে গড়িয়ে নিজেকে একজনের মনোমত ছাঁচে ঢেলে নেওয়া…সত্য…সত্য…এই সত্যই চরম সত্য !

রাধা উঠলো…যাই লো বৌদি…ঘুম আজ আর আসবে না আমার। মুচকে হেসে মিলনের ঠোঁটে একটা পুরুষোচিত চুমা দিয়ে রাধা বেরিয়ে গেল ! শির শির করে উঠলো মিলনের সর্ব্বাঙ্গ আবার।…"নাম পরিতাপে যদি ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয় !"…কী হয় ! কি হয়…তা যেন এখন বুঝতে পারছে মিলন। গলে যায়…গলে জল হয়ে ঢেউ খেলে যায়…সেই অঙ্গের পরশের উত্তাপে দেহের যমুনায় ঢেউ জাগে…দুকূল প্লাবিত করে দিয়ে যায়। ভাসিয়ে, ভেঙে ছিঁড়ে নিয়ে যায় সমাজ-সংসার সব থেকে।

ভাত নামিয়ে ফেন গালাচ্ছে। হাত দুটো কাঁপছে। গরম ফেন পড়লে পুড়ে ঝলসে যাবে। যাকগে। সে জ্বালা কি এমন বেশি! কত বার পুড়েছে মিলনের হাত-পা। আজ মনটা যে ভাবে পুড়ছে! উঃ! রাধা বললো, ঘুম হবে না, মিলনেরই কি হবে?

...বৌমা! মাছগুলো রাঁধিস মা। ও বেলা থেকে খাসনি ভাল করে।

সুদাস তামাক টানতে টানতে বলছে। স্নেহ...করুণা...বিগলিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু নরুর সেই চড়টা! সেই কঠোর কঠিন মুখের কথাকটা! সে আর ইহ জীবনে শুনবে না মিলন! শুনতে পাবে না। ঐ তমাল তলার সমাধি থেকে উঠে এসে ও যদি আজ একটা চড় কষে দেয় মিলনের গালে...মিলন কিছু বলবে না...কিছু না! গাল পেতে চড় খাবে... আর বলবে—

দূর ছাই! নাঃ! মিলন তরকারীটা চাপালো। ভাজা ভাজলো—মাছ রান্না করলো—আর কিছু বাকি নাই। তার রান্নার শিল্প নৈপুণ্যে মুগ্ধ সুদাস—বৌমা যা রাঁধে!

—রাত হোল বাবা, খেতে বসো,—মিলন বারান্দায় জায়গা করে খাবার দিল সুদাসকে। ডিজ-লণ্ঠনটা জ্বলছে—বাইরে উঠোনে জ্যোৎস্না। সুদাস কাছে বসা মিলনকে প্রশ্ন করলো,—মাছ বেঁধেছিস্?—তাকালো সুদাস মিলনের দিকে। কেমন যেন এলানো শ্রী—বন্য আরণ্যকমূর্ত্তি।

—হুঁ—মিলন পাখা করছে। হাওয়া আসছিল—তবু পাখা করছে। সুদাস বলল। থাক মা, হাওয়া আসছে। কাল চুড়ি কটা বদলে নিস আর গলায় একটা সরু হার দেবো তোকে।

—থাক বাবা।

...না—থাকলে আমার চলবে না। আমি আর ক'দিন? একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে তো!

মিলন চুপ করে রইল। সুদাস আরো দু'গ্রাস ভাত গিলে বলল—

তাছাড়া, আমাদের যখন বিধান আছে এই পুজো আচ্চা তোকেই দেখতে হবে মা, আর কাকে দিয়ে যাব বল।

—সে যখন যা হবে বাবা হবে—খাও—খাও ভালো করে! মিলন তাড়া দিল—তুমি এখনো অনেক দিন থাকবে। না থাকলে চলবে কেনো বাবা, আমায় দেখবে কে? তুমি তো বাবা বেশ!

মিলন কচি মেয়ের মতন ঠোঁট ফুলুলো। চালশেধরা চোখে সুদাস দেখছে। মনে হচ্ছে ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করে দেবে সুদাস। বলল,—তোকে কে দেখবে, তাই ভাবছি মা! সেই সন্ধানেই গিয়েছিলাম এখনি। বড় হয়েছিস্ এখন তো আর এমনি রাখা চলে না। বাপের কর্ত্তব্য করতে হবে আমায়।

তাড়াতাড়ি ভাত গিলতে লাগলো সুদাস। মিলন নীরবে বসে—ঠোঁটদুটো কাঁপছে—খেয়ে হাত ধুয়ে শোবার ঘরে এল সুদাস। ঘরে একটা টাঁক ঘড়ি আছে—কুরুভাইজার নরুর সম্পত্তি—সুদাস সযত্নে রেখেছে নিজের ঘরে। তাকালো ঘড়িটার দিকে—সাড়ে দশ! মিলন এল হুঁকো কলকে নিয়ে। হাতে নিতে নিতে সুদাস বলল—রাত হয়েছে খাও, খেয়ে নাও।

শুয়ে শুয়ে সুদাস তামাক টানছে। মিলন দু'একটা খুচরো কাজ সেরে একবাটি গরম তেল নিয়ে এল সুদাসের পায়ে মালিশ করতে। এটা নিত্যকার কাজ। থাকরে, মা। মেঘ করছে আবার। খেয়ে নে মা, আজ থাক তেল দেওয়া।

কিন্তু মিলন ততক্ষণ আরম্ভ করেছে। কোলের উপর সুদাসের পাদুটাকে নিয়ে মালিশ করছে তেল। কোমল হাত দুটি বুলিয়ে চলেছে পায়ে—শ্রান্ত সুদাস আরামে তামাক টানছে—ভাবছে এই স্বর্ণপ্রতিমা, এই স্নেহদুলালীকে ছেড়ে দিতে হবে। বিলিয়ে দিতে হবে পরের কাছে—যার সঙ্গে সুদাসের কোনো সম্পর্ক নাই! নিয়তি!

আরামে চোখ বুজে আসছে—হুঁকোটা হাত থেকে পড়ে যাবে—মিলন

সেটা নিবে ঠেসিয়ে রাখলো—সুদাস ঘুমিয়ে গেছে। বাতি রেখে আলো নিয়ে বাইরে এল মিলন! মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ—জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই—একটা ভয়াল গাম্ভীর্য আকাশের কোলে দুলছে। বৃষ্টি হবে এখনি! মিলন রান্নাঘরে এসে ভাত বাড়ল—খেতে বসল। শোঁ—শোঁ বাতাসের আওয়াজ—বিদ্যুতের ঝলক ছোট জানালাটা দিয়ে অগ্নি বর্ষণ করছে। চড়বড় করে বৃষ্টি নামলো—খেতে খেতে মিলনের স্বর গুণ গুণ করছে—ভুবন ভরি বরি খণ্ডিয়া, কান্ত পানে—বৌ—অ বৌ; বৌ…

রোমাঞ্চিত হয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ! ভয়ে শুকিয়ে উঠেছে মিলন…নরু নাকি, অ্যাঁ! দাঁড়িয়ে উঠলো মিলন—চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল সুদাসকে—বা…

—আমি—বৌ—মাধব! সারাদিন খাই নি! কোথাও আশ্রয় পেলাম না। তোমার পায়ে পড়ি বৌ—দুটি খেতে দাও।

নরু নয়—মাধব! মিলন পশ্চিমের জানালার পানে তাকালো। ক্লান্ত বর্ষাজলসিক্ত মুখখানা দেখা যাচ্ছে! কী করুণ, কতো বিষন্ন! বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটা টেনে মিলন বলল—আসবেন কি করে।

ওপাশের চাঁচাকোলে দাঁড়িয়ে ভিজছে মাধব! রান্নাঘরের পাশেই খিড়কীর দরজাটা মিলন এসে আস্তে খুলে দিল—মাধব ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে! দরজাটা আবার বন্ধ করে ফিরে এসে মিলন দেখলো—মাধবের ভিজে আলখেল্লার জলে রান্নাঘরের মেঝে ভিজে যাচ্ছে—বলল—ছাড়ুন ওটা। একটা গামছা ছিল এক কোণায়। মাধব সেইটা পরেই ছেড়ে ফেললো আলখেল্লা—নগ্ন দেহটার মাথা থেকে কোমর অবধি দেখলো মিলন একবার দৃষ্টি বুলিয়ে। বুকে কোমল রোমাবলী—বুকখানা প্রশস্ত, মাংসল রংটা চাঁপা-ফুলের মত! কোমরটা সরু—কাঁধ চওড়া!

খিদেতে নাড়ী জ্বালা করছিল মাধবের।

মিলনের এঁটো থালাতেই বসে পড়ে বলল—আর ভাত নাই বৌ—এসো দুজনেই খাই। অবাক কাণ্ড! মিলন এরকম কখনো শোনে নি!

এঁটো ভাত খাবে ও! মিলন বিহ্বল হয়ে ভাবছে কি করবে। একসঙ্গে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না মিলন—বলল, মুড়ি আনছি। ও ঘরে গিয়ে মুড়ি নিয়ে এসে দেখলো মিলন—গোগ্রাসে তার এঁটো ভাতগুলো মাধব গিলছে। আহা এতো খিদে পেয়েছে! মিলন মুড়িগুলোও ঢেলে দিল পাতে। মাধব চট্ করে মিলনের হাতখানা ধরে বলল…খাও, বসো, তুমি তো খেতেই পাও নি কিছু!

শৈলী কেড়ে খেত মাধবের পাত থেকে। মাধবও খেতো শৈলীর এঁটো। এতে কিছু খারাপ হয় জানা নেই মাধবের। টেনে বসিয়ে দিল মিলনকে সবলে, স্বাধিকারে যেন।

আশ্চর্য্য! আচ্ছা তো লোক! মিলন মাথা নীচু করে রয়েছে, ভাবছে সুদাস যদি জানতে পারে! যদি শুনতে পায় তাদের কথা? না বৃষ্টিটা বড় জোরে পড়ছে—কথা শোনা যাবে না। মাধবের পুরুষ স্পর্শ তখনো মিলনের বাঁ হাত খানা ধরে আছে। রক্তটা চলাচল করছে না মিলনের হাতের শিরায়। মাধব মুড়ি আর ভাত একসঙ্গে মেখে মিলনের মুখে এক গ্রাস তুলে দিতে দিতে বলল—খাও! তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে আজ!

খেতে চায় না মিলন—কিন্তু মাধব গুঁজে দিল মুখে। কাঁপছে মিলন—ঘাড়টা ঘুরিয়ে ভাতের গ্রাসটা চিবিয়ে গিলে নিল। ডান হাতখানা ভাতের থালায় ছুঁইয়ে দিয়ে মাধব বলল—খাও লক্ষ্মীটি। একসঙ্গে খাই। মাধব নিজেই খেতে লাগল এবার।

মিলন কিন্তু খাচ্ছে না—লোকটার কাণ্ড দেখছে বিস্মিত হয়ে। ওর অন্তরের হাসির মাধুর্য্য তখনো মুখে ফুটে ওঠে নি—নিশ্চুপে দেখছে মিলন ওর খাওয়া। কয়েক গ্রাস মুখে পুরে মাধব বলল আবার চাপা গলায়—খাও,—না খেলে আমিও খাব না—অভিমান করেই যেন মুখটা বুজলো মাধব!

মিলন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বুদ্ধি ওর বিমূঢ় হয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ মাধব এক গ্রাস ভাত মিলনের হাতে দিয়ে নিজের মুখের কাছে তুলে আনলো হাতখানা—বলল—দাও, আমায় খাইয়ে দাও তা হলে!—মিলনের আঙুল সমেত নিজের মুখে পুরলো মাধব! একবার, দুবার, তিনবার—মাধব বললো—খাও এবার—তুমি খাও, লাজ কিসের?

বলেই আর এক গ্রাস ভাত তুলে মিলনের ঠোঁটের ফাঁকে ভরে দিল। কাপড়টা এঁটো হয়ে গেল মিলনের।—তুমি না খেলে আমিও খাব না। তুমি তখন খেতে পাও নি—বলল মাধব।

সত্যি খাওয়া হয়নি মিলনের। কিন্তু এমন করে খাওয়া তো খায় নি সে কখনো। রাধা গল্প করছিল এমনিকার খাওয়ার। সে খায় তার স্বামীর হাতে—চোখদুটো একটু খুলে মিলন দেখলো মাধবকে—মাধবের চোখদুটো জ্বলছে উত্তেজনার আনন্দে। ওর নারীলোভী মন মূর্চ্ছা গেছে যেন মিলনের মুখের পরে—আবার বলল মাধব—খাও, আমার দিব্যি!

—খাই!—মিলন আস্তে এক গ্রাস মুখে তুললো। লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়েছিল, সেটা যেন ম্যালেরিয়া জ্বরের কম্পের মতন থেমে আসছে, আর সারা গা হয়ে আসছে আগুনের মত গরম! রক্তের মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য অনুভব করছে মিলন। মাধব এক টুকরো মাছ ওর মুখে দিতে দিতে বলল—এতো লাজ কেন তোমার! খাও, লক্ষীটি! খুকী!

হাসলো মিলন—হেসে ফেললো। ক্ষীণ দীপশিখার মত বেশ হাসি—তেমনি সুন্দর। মাধব অকস্মাৎ ওর মাথার কাপড়টা সব সরিয়ে দিয়ে বলল—আজকাল আর অতবড় ঘোমটা দেয় না কেউ!

সিংহিনীর সাহস জেগে উঠছে মিলনের বুকে, প্রমত্ত অম্বার নির্লাজ ভীষণতার মত,—হিঙ্গুল নদীর আকস্মিক বন্যার আবর্ত্তের মত উত্তাল, সর্ব্বনাশা হয়ে উঠলো ওর সাহস! মাথার ঘোমটা আর তুললো না মিলন—

মাছের আর খানিকটা নিয়ে মাধবের মুখে তুলে দিল—মধুর হাসিটি মধুর হয়ে আসছে! বাইরে ঝড়ের দাপট, বৃষ্টির রিম্‌ঝিম—মিলন! মা! ওমা, মিলন!

ঝড় জলের মধ্যে সুদাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—যেন আর্তনাদ। মিলন স্বগতোক্তির মত বলল, ডাকে আবার—তার পর হাত-মুখ চটকরে শাড়ীর আঁচলে মুছে নিয়ে দরজার কাছে এসে বলল—আমি জেগে আছি বাবা। ছাঁট লেগে রান্নাঘরের মশলা-পত্তর ভিজে যাবে তাই সামলে নিচ্ছি!

—আচ্ছা মা, আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম ঘুমিয়ে গেছিস! বড্ড জোর বৃষ্টিটা! ভয় করবে নাতো মা!

—না বাবা ভয় কিসের! বলতে বলতে মিলন মাধবকে ঘরে রেখেই দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ছুটে এঘরে এসে দাঁড়ালো। সুদাসের ঘরে গিয়ে বলল—ছাঁট আসেনিতো বাবা? না, বন্ধ করেছ তুমি। দেখি আমার ঘরটা—তুমি শোও বাবা, আমার কিছু ভয় করবে না—মিলন যেন চরকীর মত ঘুরে গেল নিজের শোবার ঘরে। এই উঠোনটুকু পেরুতেই ও ভিজে গেছে···দেখলো সুদাস!

যা চঞ্চল মেয়ে! ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে বললো,—আমাকে একবার তামাক দে মা!

'মরণ'!—মনে মনে বলল মিলন! কলকেটায় তামাক ভরে মিলন আগুন নিতে এল রান্নাঘরে! মাধব ভয়ে পেয়ে গেছে সুদাসের জেগে ওঠায়। ভয়ে শুকিয়ে উঠেছে একেবারে। থালাতেই হাত ধুয়ে পরণের গামছায় মুছলো। ভিজে আলখেল্লাটাই পরতে আরম্ভ করেছে, ভেজার জন্ম সেটা গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ—আজ অনাবৃত হয়ে উঠেছে মাধবের! মিলন শিকল খুলল···ওকি! কি হোল! অত্যন্ত চাপা গলায় বলল মিলন। মাধবের অজপানে তাকিয়ে হেসে ফেললো নিঃশব্দে। ঘাড় ফিরিয়ে বলল আবার—ছাড়ুন ওটা। অসুখ করবে! শুকনো কাপড় নেই?

—আছে কিন্তু বেরুলেই তো ভিজে যাবে আবার, তাই ভিজেটাই—মাধবের কথা ফুটে বেরুতে চায় না।

—যাবেন আবার কোথায় এখন? থাকুন। বাবা ঘুমিয়ে যাবে এক্ষুনি। তারপর বৃষ্টি থামলে···

মিলন চিমটে দিয়ে একখণ্ড কয়লা তুলে টিকের উপর বসিয়ে নিল··· মাধব আবার সেই গামছাটা পরছে। মাধবের পায়ের কাদা, জামা থেকে ঝরে পড়া জল আর এঁটো থালার জল গড়িয়ে মেঝেটা কদর্য্য অশ্লীল হয়ে উঠেছে। মিলন একবার দেখে হাসলো আবার একটু—কলকে হাতে বেরিয়ে গেল—শিকল না দিয়েই। উঠানটুকু ছুটে পার হল। হাত আড়াল দিয়ে কলকেটায় ফুঁ দিতে দিতে সুদাসের কাছে গিয়ে বলল—সব নোংরা হয়ে গেছে বাবা, ছাঁট লেগে। ঝাঁট দিয়ে আবার পরিষ্কার করতে হবে!

—আজ আর থাকগে মা—কাল সকালে করবি ওসব!

—না বাবা, কাজ ফেলে আমার ঘুম হয় না! তুমি শোও। তুমি ঘরে থাকলে আমার ভয় করে না।

—ভয় কিরে মা? শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির এখানে! সুদাস সস্নেহে কলকে নিয়ে টানতে লাগল।

সব যেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এমনি ভাবে মিলন নিজের ঘরে ঢুকে বাক্স খুললো। অন্ধকারে হাতড়ে বার করলো ওর বিয়ের সময়কার দামী শাড়ীটা। তার সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধা অবস্থায় এখনো আছে একখানা গরদের চাদর, আর একখানা ধুতি! গাঁঠছড়াটা খোলা হয় নি, খুলে ফেললে দোষ হয় নাকি কিছু! ভাবলো মিলন একমুহূর্ত। ধ্যাৎ—কচু হয়!—কিন্তু খোলা যাচ্ছে না—বহুদিনের গাঁঠ শক্ত হয়ে এঁটে গেছে। বঁটি গাছটা হাতড়ে নিয়ে মিলন কেটে ফেললো গাঁঠছড়ার বস্ত্রখণ্ড। শাড়ীটা ঐখানেই ফেলে দিয়ে ধুতি আর চাদর আঁচলে ঢেকে ছুটে চলে এল রান্নাঘরে। মাধব গামছা পরে পশ্চিম দিকের জানালা পানে তাকিয়ে আছে। আঁচল থেকে

কাপড় বার করে মিলন একেবারে মাধবের বুকের কাছে ধরে বললো…পরুন।

বিয়ের হলুদ কুঙ্কুমের গন্ধ রয়েছে কাপড়টায় এখনো। মাধব হাত পেতে নিল—কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে চোখ দুটো ওর। কী মহিমময়ী এই নারী। কি উদার এর প্রাণটুকু! বলল,—কেনা হয়ে রইলাম আমি তোমার কাছে মিলন!

—চুপ্ আস্তে!—একেবারে কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলল মিলন—জেগে আছে এখনো।

জলজলে দুটো ডাগর চোখ তুলে তাকালো মাধবের মুখের পানে। তৃপ্তির পরিপূর্ণ চাহনি—অসঙ্কোচ, আবেদনমাখা, আব্দার ভরা চাহনি। দুই হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করলো—

—ছাদের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ো—বলেই চলে যাচ্ছে। মাধব চট্ করে ধরে বলল—তুমি যাবে না?

—যাঃ—ছিঃ—মিলন হাত ছাড়িয়ে বোঁ করে চলে এল এঘরে। পা টিপে চলে গেল ছাদে—ঘরটা খুলে দিয়ে আঁচল দিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে দিল—এতোটুকু ভয় লাগছেনা—ভয়ের চিন্তা মাত্র নাই।

নিঃশব্দে নেমে আবার রান্নাঘরে এসে দেখলো—মাধব ধুতি পরে ঝুলিতে ভিজে জামাটা ভরে দাঁড়িয়ে আছে। লণ্ঠনটা জলছে। আঁচল দিয়ে আলোটা ঢাকা দিয়ে মিলন ইসারা করলো—যাও—। উঠোনটুকু দ্রুত পার হয়ে মাধব সিড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। সুদাস ডাকলো…মিলন।

—যাই বাবা। রান্নাঘরে শেকল তুলে মিলন লণ্ঠন নিয়েই এল সুদাসের ঘরে। সুদাস বলল—সিঁড়ির উপর গিয়েছিলি তুই?

—হ্যাঁ বাবা। ছাদের ঘরটা দেখে এলাম একবার।—মিলন অসঙ্কোচে মিথ্যা বলল—সত্যের মতই স্ফীত।

—আলো নিয়ে যাস্ মা—হোঁচট খাবি না হলে—আর কি বাকি তার ?—হুঁকো নামিয়ে শুলো সুদাস।

—হয়েছে বাবা। কাপড় এঁটো হয়ে গেছে। হাত পা ধুয়ে ছেড়ে ফেলবো—শোও তুমি—

সুদাস নিশ্চিন্তে শুলো। মিলন ওর ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এল। বাক্সটার জিনিষগুলো ছত্রখান হয়ে গেছে। থাকগে! শাড়ীখানার জরী ঝিলমিল করছে। ভারী সুন্দর শাড়ীটা—তখনকার বেনারসী। পরে পরবে বলে প্রমাণ শাড়ী দেওয়া হয়েছিল···মিলন ওটা এখনো পরতে পারে—পারে।

এক ঘটি জল নিয়ে মিলন হাতমুখ ধুতে গেল। আবার কি ভেবে একটুকরো সাবান বার করে আনলো—মুখে হাতে মাখলো। মাধবের গামছা দিয়ে মুছলো, তারপর চুল ঠিক করে কপালে ভালো করে টিপ এঁটে মিলন কাপড় পরতে লাগল! বাইরে বৃষ্টির বিরামহীন—ভুবনভরি বরিষিয়া বর্ষার মেঘ নেমেছে—জয়দেবের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্"—আকাশজুড়ে আসর জমিয়েছে—এইতো অভিসারের সময়। মিলন চুলটা আবার ঠিক করলে—আবার শাড়ীখানা গুছিয়ে পরলো—আবার মুছলো মুখ···ভাঙা আয়নায় দেখছে!

নাক ডাকছে সুদাসের। নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হয়ে উঠলো চিত্ত মিলনের। ছোট্ট একটা বাক্স খুলে বার করলো দুটি দুল—ওর একমাত্র অলঙ্কার। কাণের লতায় পরছে, আর ভাবছে—ও হয়তো বসেই আছে প্রতীক্ষায়। হয়তো বোশরের সেই "পততে পতত্রে বিচলিত পত্রে—" নাঃ; আর দেরী করবে না মিলন। জীবনের শ্রেষ্ঠতম এই ক্ষণটুকুকে হারাবে না সে। যা হয় হোক—যত কুৎসা রটে—রটুক, মিলন প্রস্তুত আজ সব সইতে। না হয় বার করে দেবে সুদাস। দেবে—দেবে। চলে যাবে মিলন ওরই সঙ্গে, ঐ মাধবেরই সঙ্গে! ও আবার এল—আচ্ছা দুঃসাহসী তো! এমন না

হলে পুরুষ! বেশ করেছে এসেছে! ঠিক সুন্দরের মত এসেছে—লুকিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে—তা সুড়ঙ্গ বই কি! আজ যা অন্ধকার আর বৃষ্টি। উঃ যেন চুমুক দিয়ে খাওয়া চলে অন্ধকারকে—একে সুড়ঙ্গ বলা কিছু বেশি বলা নয়। সুন্দর এসেছে—মিলন যেন রাজকুমারী বিদ্যা। সুন্দরকে পরীক্ষা করবে—দেখবে কেমন পণ্ডিত। আর দেখে কাজ নাই। যা একখানা কাব্য লিখেছে। ভুরিভুরি ভুল। ও আবার বই লিখতে যায়। কিন্তু পড়েছে তো। পড়েছে অনেক। ও জানে, সুন্দর কেমন করে বিদ্যার কাছে এসেছিল—জানে বলেই তো এসেছে—নইলে কি সাহস করতো। ওর মন ঠিক সুন্দরের মতনই দুঃসাহসী।

মিলন উঠে দাঁড়ালো—অলঙ্কারের স্বল্পতা মনকে পীড়া দিচ্ছে ওর। কিন্তু কি করতে পারে? কোথাও আর কোনো অলঙ্কার নেই ঘরে। মিলন থামলো একটু। জানালার ওপাশে গাঁদা ফুলের গাছে ফুলগুলো ভিজছে—হাত বাড়িয়ে দুটো ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজলো—এতোক্ষণে তবু মনটা প্রসন্ন হতে চলেছে—ফুল শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। ওর সুন্দরের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে মনে—কুল-মান-লাজ কৈ? সেই তো ভাঙা আয়নায় মুখখানা আর একবার দেখে নিল মিলন, খোঁপাটাও। বেশ কিছু দেখা যায় না—থাক্! ওর চোখেই দেখবে গিয়ে মিলন নিজেকে। আয়নাটাও আছে ওখানে—কিন্তু আলো। আলোটা নিয়ে যাবে কেমন করে! থাক্‌গে।

মিলন কতকালের আধপোড়া একটা মোমবাত্তি বার করলো—দেশলাইটা নিল···লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল আস্তে—কাঁপছে বুকখানা! কেন? কাঁপছে কেন? মিলন সাহস ফিরিয়ে আনতে চায়—বিদ্যুৎ আলোকে মন্দিরটা দেখা গেল—সুদাসের ঘরের দরজাটা—তমাল গাছটাও। ভয়ের কী আছে! ঘুমুচ্ছে সবাই।

মিলন এক পা বাড়ালো। সিঁড়ির উপর মৃদু নিঃশব্দ পদক্ষেপ—পৌঁছালেই

দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে নেবে ওকে মাধব—প্রত্যাশায় গোপন কথা শুনছে মিলন—জড়িয়ে নেবে—কারণ ও বিস্তার সুন্দর। ও জানে—কেমন করে কি করতে হয়—পড়েছে ও ঐ বইখানি! মিলন বাধা দেবে, বলবে "না—না, প্রভু আজি ক্ষমা করো—কালি হবে"—অমনি মাধব বলবে "তুমি পর্ব্বজিনি, মুহি ভাস্কর লো—ভয় না কর নাকর, নাকর লো—" ও ঠিক বলবে। ওর মুখস্থ আছে। ঠোঁট দুটি হাসিতে রঞ্জিত হয়ে উঠলো মিলনের—আস্তে দরজা ভেজিয়ে উঠে এল।

সুদাসের প্রশ্নটা শুনেছিল মাধব—সিঁড়িতে উঠবার সময়—দুরু দুরু বুকে ছাদে এসে দাঁড়ালো—নাঃ আর কিছু তো শোনা যায় না। পুলিশে খবর দিতেই গেল নাকি। কিন্তু মিলন তাহলে জানিয়ে দিত এসে! কয়েক মিনিট উৎকর্ণ হয়েই রইল মাধব। কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বিছানাটায় বসলো। শোবে? ঘুমুবে? যদি এর মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে! দূর্ এই বাদলে পুলিশ! যত মিথ্যে ভাবনা! ঝোলাটা রেখে টান হয়ে শুলো মাধব। কোমল শয্যা—কতকাল শোয়নি সে এমন করে। পরণের গরদের কাপড়টার স্নিগ্ধতা, বেশ আরাম দিচ্ছে ওকে! একটু ঠাণ্ডা লাগছে। জানালাটা বন্ধ করে দেবে নাকি। থাক্—বেশ লাগছে! মিলনের মুখখানা মনে পড়ছে! হ্যাঁ, সুন্দর বটে, যেন পটে আঁকা! কী চমৎকার চোখদুটি! শৈলী দেখতে মন্দ ছিল না—দলের সেরা সুন্দরী ছিল শৈলী, কিন্তু মিলন অপরূপ। সম্পর্কে মিলন ভাদ্রবৌ—হাত ধরে তার মুখে খাবার তুলে দিল মাধব আজ! পাপ হোল নাকি! হয়তো হোক! বেশ মেয়েটা! ও না থাকলে মাধব কোথায় যে আশ্রয় নিত কে জানে। থানাতেই যেতে হত হয়ত! থানা! ওরে বাপ্! মাধব চমকে উঠলো। এই আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থানার কথা চিন্তা করার মত দুঃখদায়ক কিছু আছে নাকি আর!

বিড়ি একটা খেতে হবে, কিন্তু দেশলাই জ্বাললে যদি সুদাসের চোখে পড়ে! ভাববে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! মাধব সাহসে ভর করে বিড়ি

ধরাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু দেশলাইটা ভিজে গেছে, জলছে না—শব্দ হচ্ছে খটাস্—খটাস্। নাঃ জললো না। বিশেষ আর চেষ্টা না করেই মাধব পাশ ফিরে শুলো। মিলনের কথাই মনে হচ্ছে। ওর মহান অন্তরের কথা। শ্বশুরকে লুকিয়ে আশ্রয় দিল—কাল ভোরে শাড়ীটা দিয়ে বাঁচিয়েছে। আজ খাবার দিল ঐ মিলনই, শোয়ালো এমন আরামদায়ক বিছানায়। মাধবের অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ঋণ শোধ করা যাবে না। কী দিয়ে শোধ করবে মাধব। নিজেরই এক পা জেলে একপা বাইরে—শেষ আর করবে কি দিয়ে···ঋণীই রয়ে গেল মাধব।

নারী-রূপের অদৃশ্য আবেদন আবার মাধবকে বিচলিত করছে। নাঃ মিলন সেরকম নয়। শান্ত সুশীলা পল্লীবধূ মিলন। গৃহলক্ষ্মী, গ্রামলক্ষ্মী। সেতো শৈলী না যে, খালি ফাজলামী করবে। যতটুকু দরকার তার বেশি কথা কইল না মিলন···আহা, এই বয়সে বিধবা হয়ে গেছে! কে যে দেখবে ওকে! ও আর আসবে না এখানে। ঘুমিয়ে গেছে হয়তো! আর কি জন্যেই বা আসবে! আসাও ত বিপজ্জনক—তার পক্ষে, মাধবের পক্ষেও। সুদাস জানতে পারলে মাধবকে এবার পুলিশে দিয়ে ছাড়বে। ভোরের অনেক আগেই পালাবে মাধব—বৃষ্টিটা ধরলে হয়—কমেছে বৃষ্টি, এবার থামবে, থামলেই চলে যাবে মাধব। কোথায় যাবে ঠিক নাই, যেখানে হোক যাবে—যেতে পারলেই বাঁচা যায়।

বেশ আরাম লাগছে। ঘুমিয়ে গেলে মিলন নিশ্চয় ভোরের আগেই তুলে দিতে আসবে। হাঁ, আসবেই! মাধব চোখ বুজলো- ঘুমিয়ে গেল —শ্রান্তি, রাতজাগা, অতিরিক্ত খাওয়া—তারপর এই নিশ্চিন্ততার আশ্রয় ঘুম পাড়িয়ে দিল ওকে শিশুর মত!

অভিসারিকার মতই আস্তে উঠে এল মিলন! ঘরে ঢুকেই অনুভব করলো নিদ্রিত ব্যক্তির নিশ্বাস! ঘুমিয়ে গেছে? অবাক কাণ্ড তো!

এমন করে আসবার জন্ত লজ্জা করতে লাগল মিলনের। কিন্তু ফিরে যাবে? এত আশা নিয়ে এসে ফিরে যাবে? কি করা উচিৎ! কী বলা উচিৎ—কি ভাবে উঠোনো যায়! নাড়া দিলে যদি চেঁচিয়ে ওঠে!—মিলন ভাবতে লাগলো দাঁড়িয়ে। ঘনঘন বিদ্যুতের আলো—কড়কড় বজ্রধ্বনি···অবিরাম বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটা! পশ্চিম থেকে পূর্ব্বের জানালা দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে প্রবল বেগে! মিলনের পাত্‌লা শাড়ীটা উড়ছে পেখমের মত!—জানালা বন্ধ করে মোমবাতিটা জ্বালালো মিলন। ক্ষীণ আলো—কিন্তু এই ঘরের পক্ষে যথেষ্ট! আয়নায় নিজেকে দেখলো একবার—দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল—চমৎকার মানিয়েছে ওকে! টিপটা আর একবার টিপে নিয়ে মাধবের লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বলল—শুনছো। ঘুমুলে যে! ওগো!

ধড়মড় করে বসে পড়লো মাধব। ভয়ে প্রায় কাঁপছে ঠোঁট দুটো, বলল—কেন! কেন! রাত নাই নাকি!

—আছে—অনেক আছে রাতে! মৃদু হেসে বলল মিলন! ততক্ষণে মাধব খাট থেকে নেমে পড়েছে!

বিড়ি একটা বার করে মোমবাতির শিখায় ধরিয়ে নিতে নিতে বললো—ইস্, ভ্যাগ্যিস ডেকে দিলে—তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না বৌ—বড্ড উপকার করলে তুমি!—বিড়িতে টান দিল মাধব। মিলন বিছানার বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে—কোন উত্তর দিল না—পা দোলাতে লাগলো আস্তে আস্তে। জানালার কাছে গিয়ে কবাট খুলে দিতে হুহু করে হাওয়া ঢুকে নিবিয়ে দিল বাতিটা—।

—যা! নিবে গেল বাতিটা! বললো মাধব নিজের মনেই যেন। কিন্তু মিলনের অন্তরে আশার গুঞ্জন উঠছে। নিঃশব্দে বসে রইল। চোঁ চোঁ করে বিড়িতে টান দিচ্ছে মাধব—মিলন ভাবছে আলোটা নিবে ভালোই হয়েছে—এবার এসে শোবে নিশ্চয়। মাধব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে

বলল।—থামছে বিষ্টিটা—না?—মেঘ কেটে যাচ্ছে। চাঁদের ফিকে আলো একটুকরো ঘরে এল। মাধব বিড়িটা ফেলে দিল, মশারীর ডাণ্ডায় ঝোলানো ঝোলাটা টেনে নিয়ে ওদিকের দেওয়ালের গায়ে গুটানো একখানা ছাতা নামিয়ে নিল—ছাতাটা নরুর, এই পাঁচ বছর সযত্নে তোলা আছে।

—রাত খুব বেশি নাই বৌ। চারটায় ট্রেণ যদি ধরতে পারি তো একদমসে এলাহাবাদ চলে যাব।

—না—না—রাত খুব বেশি আছে···তাছাড়া বৃষ্টি পড়ছে এখনো—মিলন দাঁড়িয়ে উঠে চাদরখানা ধরলো মাধবের।

—হয়তো আছে, কিন্তু নদীতে বাণ এসে পড়লে আর পেরুনো যাবে না—মাধব চাদরটা খুলে দিল গা থেকে।

—এই ছাতাটাও নিলাম আমি বৌ—নরুর ছাতা, তা হোক—তুমি সাক্ষী রইলে, চুরি করি নাই আমি।

ঝোলাটা কাঁধে ফেলে মাধব যাবার জন্য পা বাড়ালো—মিলন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—এতক্ষণে যেন অসম্বৃতা হয়েই বলে ফেললো—রাতটা থেকে যাও, লক্ষীটি—একেবারে মাধবের কোলের কাছে এসে পড়ল।

ওর পিঠে হাত রাখলো মাধব। রোমাঞ্চিত হচ্ছে সর্বাঙ্গ মিলনের—এইবার মাধব ওকে টেনে নেবে, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের মত মাধব বলল—তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ বৌ, বুঝতে পারছো না, কি বিপদ মাথায় আমার ঝুলছে। রাত থাকলে আর রক্ষে থাকবে না—খেলাম, ঘুমুলাম, আর না—এবার যাই!

সস্নেহে মাধব ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল একবার, তারপর খুব আস্তে বলল,—সম্পর্কে তুমি ভাদ্রবৌ—কিন্তু মা'র থেকে বেশি উপকার করলে তুমি আমার—যদি বেঁচে ফিরি তো আবার আসবো, আবার—আসি।

খড়িতে বেরিয়ে পড়ল মাধব ছাদে—তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে।

তারপরেই খিড়কীর দরজা খুলে নদীর কিনার দিয়ে আবছামত হতে হতে মিলিয়ে গেল তার মূর্ত্তি। নিস্পন্দ নির্ব্বাক দেখলো মিলন—দেখলো না কিছুই—দেখতে চায় নি। ব্যর্থ বাসরসজ্জার নিবিড়তম লজ্জা ওকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—প্রত্যাশার হতাশ বঞ্চনা ওকে আর্ত্ত করে দিচ্ছে —বুকের উষ্ণ রক্তস্রোত তুষারের মত অতিরিক্ত শীতলতার অনুভূতিতে আড়ষ্ট করে দিতে চাইছে ওর শরীর মন। ঘৃণা হচ্ছে মিলনের নিজের উপর! ও: লোকটা একবার তাকিয়ে দেখলোওনা মিলনের পানে! ভীরু কাপুরুষ! এতো ভয়!

—মিলন, ওমা মিলন! বৌমা!—সুদাসের কণ্ঠস্বর। যাবে কি করে মিলন তার কাছে! এই বেশ, এই রূপসজ্জা! লজ্জা—লজ্জা—লজ্জা—! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় মিলন। সুদাস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে।

—বৌমা! খিড়কীর দোরটা খুলে রেখেছিলে বাছা—কৈ তুমি? কোথায়? গোরু নাকি ঢুকলো একটা।

—যাই বাবা! মিলনের কণ্ঠস্বর কাঁপছে—ঠিক কান্নার মত শোনাচ্ছে। উঠে আসছে সুদাস—ভগবান! অকস্মাৎ মিলন বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ব্যর্থ, ব্যর্থ তার জীবন, যৌবন, সব! হাতে টর্চ্চ নিয়ে সুদাস দাঁড়ালো এসে দরজায়। সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ফুলে, দুলে দুলে উঠছে মিলনের। নরুর খাটে শুয়ে মিলন! এমন করে বিয়ের সময়কার শাড়ী পড়ে মিলন নরুর শোবার খাটে শুয়ে কাঁদছে! এতো ভালোবাসে নরুকে মিলন! আশ্চর্য্য! আজ আষাঢ়ের বর্ষাধারায় ওর চিরবিরহিনী অন্তর আকুল হয়ে উঠেছে—বুঝি স্বামীর জন্ত—আহা! মা আমার—এই তুই—এমন সতী তুই—এমন পতিপরায়ণা!

—মা—মা—মা আমার—কি হোল মা! কেন কাঁদছিস—আমি তোর বিয়ে দেব বলেছি—তাই? না মা—বুড়োছেলের উপর রাগ করিস না—

তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু করবার নাই—বলতে বলতে সুদাস মিলনের দেহটাকে পাঁচ বছরের খুকীর মত বেষ্টন করে মাথায় চুমা দিল—ওঠ মা—ওঠ্—নরু আছে—আছে এই ঘরে—ওঠ্।

মিলনের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে···ওগো, মিথ্যে, মিথ্যে সব! মিথ্যে তোমার নরুর আশা, মিথ্যে আমার রূপ-যৌবন···কিন্তু কিছুই বললো না। মিলন···ওর বিদ্রোহী অন্তর গুমরে উঠছে পুরুষ জাতের বিরুদ্ধে ···পুরুষের পৌরুষহীনতার বিরুদ্ধে। সুদাস বলল···ওঠ মা! এমন করে যে তুই নরুর স্মৃতি আগলে আছিস তাতো জানতাম না মা···আমার বোকামি।

ঠোঁটের কোণায় সেই হাসিটি···মিলনের···ঠোঁট দুটি একটু বেঁকে গেল কিন্তু আলো জ্বালা নেই দেখতে পেল না সুদাস···মিলনের বুকফাটা হাসিটা গুমরাচ্ছে বুকে! দেওয়ালে একটা ফটো···আবছা আঁধারে ফ্রেমটাই নজরে পড়ে। নরুর আর তার কলেজী বন্ধুদের ছবি···কোন্ কালে তুলিয়েছিল···সুদাস সযত্নে টাঙ্গিয়ে রেখেছে। সেই দিকে চেয়ে মিলন বলল···ঐ ছবি থেকে ওর ছবিটা আমায় বড় করে বাড়িয়ে দাও বাবা ···মুখে ব্যঙ্গের হাসি, কণ্ঠস্বর কান্নাভরা।—টর্চ্চ টিপে ছবিটা দেখতে গিয়ে সুদাস বলল—বড্ড মনে করিয়ে দিলি মা—কালই করিয়ে দিচ্ছি।

স্নেহ-দুর্ব্বল নির্ব্বোধ পিতা। ঐ ছবিটায় নরুর মূর্ত্তিটাই দেখছে দাঁড়িয়ে। মিলন বালিশে মুখ গুঁজে আর একবার হেসে নিল। মাধবের পরিত্যক্ত চাদরখান গায়ে জড়িয়ে উঠে বলল—খিড়কীর দোরটা বন্ধ করিনি নাকি বাবা? গরু ঢুকেছিল?

—কি জানি মা, মনে হোল, রাধাদের সেই কালো গাই গরুটা বেরিয়ে গেল যেন, চল দেখি।

হবে বাবা! মনের আজ ঠিক ছিল না আমার···সুদাসের আগেই মিলন প্রায় ছুটে নেমে এল নীচে···নিজের ঘরে গিয়ে চাদরটা ফেলে দিয়ে

কাপড়খানা ছাড়লে···তারপর লণ্ঠন নিয়ে খিড়কীর দরজা বন্ধ করতে গেল। সুদাস তামাক সাজছে আর ভাবছে সে অন্যায় করেছে মিলনকে সন্দেহ করে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এই কি বাপের কাজ! নাঃ মিলন খারাপ হতে পারে না। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী ওর আদর্শ। বেহুলার মত ও স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে স্বর্গে যাবে···বাঁচিয়ে আনবে স্বামীকে ওর···ও শুধু সতী নয় ···মহাসতী। সুদাসের শিক্ষায় এবং শিক্ষকতার অহঙ্কার বৈষ্ণবোচিত বিনয়কে অতিক্রম করে যাচ্ছে···মিলন·· মহাসতী মিলন!

মিলন খিড়কীর দরজার কাছের ঝিঙে আর লাউলতাগুলো টান দিয়ে হিঁচড়ে নামিয়ে দিল···কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল চটুকে··· হাসছে মিলন···খিড়কীদোর বন্ধ করতে করতে বলল—

···গোরুটা বড্ড চোর বাবা···দেখছো···লাউলতাটা খেয়ে মুড়িয়ে দিয়েছে···ঝিঙেগাছটাও··কাঁটকুড়ির গোরু!

···যাক গে মা! গাল দিসনে আর রাতের বেলা!···সুদাস সান্ত্বনা দিচ্ছে মিলনকে। হাসছে মিলন খিক্-খিক্-খিক্···হিঃহিহিহিহিঃ! মুখে আঁচল চেপে হাসিটার আওয়াজ বন্ধ করে দিল। সুদাস বলছে···সারাটা দিন খাস নি! তাই সারা রাত কাঁদলি, এবার ঘুমো দেখি, তুই লক্ষ্মী মেয়ে ··আয়, ঘরে আয়।

কণ্ঠস্বর স্নেহসজল·· করুণা বিগলিত হৃদয়ের পরিবেদনা। লণ্ঠন নিয়ে আসছে মিলন,···রাখবার জায়গা নাই তো কেন যে গোরু পোষে হারামজাদারা!···মিলন বলল আবার! বাদলার সুবিধে পেয়ে দিল ছেড়ে। লোকের গাছপালা থাক গে।

···দরজাটা তুই বন্ধ করিস নি মা···গরুছাগল তো আসবেই। যা, শো এবার।···সুদাস শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মিলনকে। ···ঘুমো···বুঝলি মা, ঘুমো এবার···বলে নিজের ঘরে গেল!

প্রতারণা!···লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে মিলন হাসছে। জোরে হাসতে

ইচ্ছে করছে ওর···কিন্তু কি হচ্ছে তার এমন প্রতারণা করার মানে! ব্যর্থ তো সবই। জীবন ব্যর্থ, যৌবন মিথ্যা···সাজসজ্জা লজ্জাকর! অনর্থক এক নিরীহ নির্ব্বোধ শিশুবৃদ্ধকে প্রতারণা করে লাভ কি হোল মিলনের! হাসিটা জমাট বেঁধে গেল···স্তব্ধ হয়ে আসছে রক্তস্রোত। মিলন খাড়া দাঁড়িয়ে রইল জানালার একটা রড ধরে।

নদী পেরুতে পারলো না মাধব। বান এসে গেছে। রাত আর নাই হয়তো। মৃত্যুভয়ে কাতর মাধব নদীর তীর ধরেই হাঁটতে লাগলো দ্রুত গতি—সকালে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে এখন চলেছে পূর্ব্বদিকে। নদী পার হ'য়ে নিরাপদ হবার চিন্তা ছাড়া কোনো চিন্তাই ও এতক্ষণ করতে পারেনি। পাশে পড়ে রইল গ্রাম—মাধব বহুদূর হেঁটে চলে গেল কিনারায় কিনারায়। ওঃ রাত তো অনেক ছিল দেখছি—এখনো ভোর হচ্ছে না!—মাধব নিজের মনেই বলল! মিলন বলেছিল, "রাত আছে—" কিন্তু থাকলেইবা কি! সকালের দিকে বান আরো বেশি হবে। নৌকাও এ সব নদীতে চলে না—তখনইবা পেরুবে কি করে মাধব! চলে এসে ভালই করেছে—কিন্তু মিলন বলেছিল—রাতটা থেকে যাও লক্ষীটি—! কি মিষ্টি কথা! কী অপরূপ মিষ্টি! মাধব আর কখনো শোনেনি এমন। খুনীর আসামীকে অমন সদয় হ'য়ে আশ্রয় দিতে পারে সে মানবী নয় দেবী। বয়সে ছোট না হলে মাধব আজ প্রণাম করতো ওর পায়ে। হবে না কেন! ওর মন এখনো কচি, কোমল—ওতো জানে না, মাধবকে আশ্রয় দেওয়ায় বিপদ কতখানি। ওরও বিপদ মাধবেরও বিপদ। আহা, বড় চমৎকার মেয়ে মিলন! থাকতে বলছিল—বলে, থেকে যাও রাতটা! ছেলেমানুষী আর কি! সুবাস জানতে পারলে ওকে বাড়ী থেকে বার করে দেবে আর মাধবকে তো নিশ্চয় পুলিশে দেবে—না! মিলনের কোন বিপদ যেন না ঘটে। ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন!—মাধব বিড়ি ধরালো একটা! বৃষ্টিটা গুড়ি গুড়ি পড়ছে। একটা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালো

মাধব—ভূত, পেত্নী থাকতে পারে! দূর, মাধবই তো আজ ভূত! অন্ধকারে ঠিক ভূতের মতই দাঁড়িয়ে আছে!—হাসি পেল মাধবের!

শৈলী যদি ভূত হয়ে থাকে! হবেই তো—অপমৃত্যুতে মরেছে, তার উপর গর্ভিনী অবস্থায়! ভূত নিশ্চয়ই হয়েছে শৈলী। যদি আসে, যদি মাধবের টুঁটি টিপে ধরে এসে!—শরীরটা শিউরে উঠছে মাধবের। বিড়ির আগুনটা নেবাতে সাহস করছে না—ঐ আগুনেই আরেকটা বিড়ি ধরালো, কিন্তু বিড়ি ফুরিয়ে এসেছে—সকাল না হলে আর কেনা হবে না—মাধব অন্ত চিন্তা করতে লাগল ভূতের কথা বাদ দিয়ে! শৈলীর চিন্তা বাদ দিয়ে আর কার চিন্তা করা যায়! কুসুমের! দূর ছাই—না, কুসুম তার উপকার করেছিল! তাকে সতর্ক করে সময় থাকতে পালাবার সাহায্য করেছিল। না হলে মাধব আজ জেলে পচ্‌তো। কুসুমের কাছে কৃতজ্ঞ মাধব—আর এই মিলনের কাছে! পৃথিবীতে এই দু'জনার কাছে তার কৃতজ্ঞতার ঋণ রয়ে গেল। কিন্তু মিলন বলল থাকতে! আর কিছুক্ষণ থাকলেও হোত। অনেক রাত আছে—কিন্তু দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকা যায়। ছাতাটা আবার খুলে মাধব হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কাদা, খাল, খন্দর, কাঁটাঝোপ কত কি! উঃ, দুঃখের তিমিররাত্রি একেবারে! মিলনের পাতা সুখশয্যা মনে পড়ছে। আরো ঘন্টাখানেক যদি থাকতো! কেন থাকলো না! একগুঁয়েমি করে চলে আসা অন্যায় হয়েছে ওর। সুদাস কিছুই জানতে পারতো না—জানতে দিত না। মিলন যেমন কৌশল করে তখন জবাব দিল সুদাসের কথায়—সেই রান্নাঘরে, তারপর মাধব যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখনো সুদাস সন্দেহ করেছিল, কিন্তু মিলন নিশ্চয় বুদ্ধি ক'রে ঠেকিয়ে রেখেছিল সুদাসকে। আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়েটা। তবে বড্ড লাজুক! খাইয়ে দিলেও খেতে চায় না—কথা তো বলতেই চায় না। ওতো আর শৈলী নয় যে, অশ্লীল সব ইঙ্গিত করবে! ওকে যখন মাধব বললে—"তুমি যাবে না!" মিলন বলেছিল—

যাঃ ছিঃ"। মাধবের ইঙ্গিতের কদর্য্যতায় ও পীড়িত হয়ে উঠেছিল নাকি! ভ্রাতৃবধূ ও সম্পর্কে! ছিঃ ছিঃ কি মনে করছে মাধবকে!

কিন্তু এলোও তো আবার!—বিড়িটা ফেলে দিল মাধব—কেন এলো! মাধবকে ঘুম থেকে উঠাতে, না অন্য কোনো কিছু ছিল তার অন্তরে! ছিল হয়তো—না হ'লে অমন করে রাতটা থাকতে বলবে কেন! ছিল! যুবতী মেয়ে। ওর মনে কোনো পিপাসা নাই—এ হতে পারে না—ছিল মনে কিছু! কিন্তু—যাঃ ছিঃ—বললো কেন। বলে—ওরা বলে ওরকম। শৈলীও বলতো। অথচ সেই শৈলীই শেষকালে স্বীকার করে গেছে নিজমুখে। মিলনও বলেছিল—ছিঃ—কিন্তু এসেছিল হ্যাঁ, মনে পড়ছে, শাড়ীটা বদলে এসেছিল—মাথায় গাঁদা ফুল ছিল, আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে হাতে ঠেকেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ এতো বড়ো ভুল করলো মাধব!

দাঁড়িয়ে গেল মাধব ঐখানেই। ফিরে যাবে নাকি! না! ফেরার আর উপায় নাই। ঊষার রক্তরাগ আকাশের বুকে যেন চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে মাধবকে। ভোর হতে বড় জোর আর আধ ঘন্টা। দু'ঘন্টা অন্ততঃ হেঁটে এসেছে মাধব। যে বেগে এসেছে, সে বেগে ফেরা অসম্ভব। মাধব যেন ভিজে গেল ভিজে ব্লটিং কাগজের মত!

ভোরের আলো ফুটে উঠছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। দেখতে পেল,—আকন্দ ফুলের বড় বড় ঝাড়গুলোতে নীলচে ফুলের গুচ্ছ। কালো চুলে মানায় ভালো! একগোছা ছিঁড়লো মাধব আনমনেই। সাদা রস হাতে লেগে যাচ্ছে—মিলনের হৃদয়ের রক্ত যেন পাণ্ডুর শ্বেত রক্ত! নদীর দিকে চেয়ে দেখলো, আবর্ত্তিল ফেনিল গৈরিক স্রোত! যেন দুকূল ভেঙে, ভাসিয়ে অবলুপ্ত করে দিতে চায় সবকিছু! মাধব হাতের ফুলগুচ্ছটি ফেলে দিল স্রোতের জলে—তৎক্ষণাৎ মিলনের বাড়ীর বিপরীত দিকে ডুবে ভেসে ঘূর্ণিতে তলিয়ে গেল সেটা—স্রোতের আবর্ত্তে লুপ্ত হয়ে গেল!

সামনেই চল্‌ছে মাধব। মাইল খানেক দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে—সেখানেই যাবে। পা দু'টো ওর চলছে না—মনটা যেন লোহা, কিন্তু ভাবতে পারছে না, শুধু একটা দুর্বার চুম্বকার্ষণ অনুভব করছে পিছনে—তবু ওকে সামনেই চলতে হবে—ফাঁসীর ভয়, দ্বীপান্তরের ভয়।

—ভীরু—কাপুরুষ! নিজের মনেই বলল মাধব! নিজেকে নিষ্ঠুর তিরস্কার করলো যেন। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল যেন! একবার দেখে এল না! একটি চুমা দিয়ে এল না—একটু আদর করে এল না! কে জানে, কি ভাবছে মিলন! ও এসেছিল, এসেছিল অনেক আশা নিয়েই। ওকে অপমান করেছে মাধব—ওর কামনাকে ব্যর্থ করে মিলনকে অভিশপ্ত করেছে মাধব—খুনীর শাস্তির থেকে সে অভিশাপ কি কম কিছু! কেন বুঝলো না? কেন সে বুঝলো না মিলনের অন্তরের আবেদন! শৈলীকে বোঝে'নি—তার শাস্তি বয়ে বেড়াচ্ছে মাথায়। আবার মিলনের মন বুঝলোনা। তার শাস্তি হয়তো আরো কঠিন হবে। হচ্ছেই তো! এ আপশোষ মৃত্যুভয়ভীত আসামীর মনের দুঃখের থেকে কম নয়। মিলনের অন্তরে মাধব আসন পেতেছিল গত রাত্রে। মিলন চেয়েছিল তাকে—রাতটা থেকে যাও লক্ষীটি!—ওর বেশি বলতে পারে না ওর মত মেয়ে। ঐ যথেষ্ট বলেছিল—ওর করুণতম আবেদন, ওর অন্তর-নিঙ্‌ড়ানো আবেদন—নাঃ মাধব ফিরেই যাবে—যা হয় হোক!

অকস্মাৎ মাধব গতি পরিবর্ত্তন করলো উল্টোদিকে। কয়েক পা দ্রুত চলে এল চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত। বেশ ফর্সা হ'য়ে এসেছে—একরশি দূরের মানুষ চেনা যায়।

সারাটা গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে হবে দিনের বেলা। ধরা তাকে পড়তেই হবে—না! একূল-ওকূল দুকূলই নষ্ট হয়ে যাবে অনর্থক! মিলনের কাছে যাওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীন থাকবে না হয় তো। হয়তো থানার কাছেই ধরে ফেলবে দারোগা!—ভয়ে পা দু'টো কেঁপে উঠলো মাধবের। আজ

আর যাওয়া যায় না—না! দৃঢ়কণ্ঠে কথাটা বলে মাধব আবার ফিরলো পূর্ব্বদিকে! সেই ছোট গ্রামটার দিকে! গ্রামের মধ্যে একটা দোকানে এসে বিড়ি কিনলো তিন বাণ্ডিল একেবারে! একটা ধরালো—ইষ্টিশান কদ্দুর মশাই?—শুধুলো দোকানীকে!

—হবে, আধ কোশ ট্যাক।

মাধব চলতে লাগলো আবার। ট্যাঁকের টাকা কটা ঠিক আছে! টিকিট কিনবে। সকালে একখানা ট্রেণ যায় হাওড়া-কলকাতা। ঐটা ধরে কলকাতাতেই আবার একবার যাবে মাধব। বিরাট সহর। বিপুল জন-কোলাহল—কে কার খোঁজ রাখে। আত্মগোপন করা অধিকতর সহজ ঐ জনারণ্যে। মাধব ষ্টেশনের সিগন্যালটা দেখতে পেল নেমেছে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল—হাঁপিয়ে উঠলো! ষ্টেশনে যখন এসে পৌছলো তখনো ট্রেণের দেখা নাই। টিকিট কেটে ভাবছে, ষ্টেশনে কেউ তাকে আবার চিনতে পারে! ট্রেণ এলে বাঁচা যায়—চড়ে মাধব এককোণে বসে পড়বে—বাঁচবে মাধব!

ট্রেণও এল। নিদারুণ ভীড়। এই একখানা মাত্র ট্রেণ সারাদিনের মধ্যে। ঠেলাঠেলি করে মাধব উঠলো জানালা গলিয়ে। ওপাশের বেঞ্চিতে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়ে—উঠে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো তার গায়েই। মেয়েটা গাল দিয়ে উঠলো—আঃ মলো-যা। চোখে দেখতে পাও না আঁটকুড়ো!—মাধব কড়যোড়ে তাকে মিনতি জানিয়ে বললো—মাফ্ কর মা। কে কার কথা শোনে। মেয়েটা ক্ষেপে উঠলো, বলল—মাফ্ করো—আবার ঢং করা হচ্ছে, মিন্‌সে কোথাকার। থেমে গেল মাধব। মাফ্ চাওয়ার পরও যদি কেউ গাল দেয় তো তার সঙ্গে যুদ্ধ্ করবার মত মনের জোর এখন নেই মাধবের। বসবার স্থান হওয়া অসম্ভব—মাধব দাঁড়িয়ে রইল—মেয়েটা তখনো গাল দিচ্ছে!

চার পাঁচটা ষ্টেশন পেরিয়ে একটা জংশন। জন চার পাঁচ নেমে গেল, কিন্তু উঠলো বিশ-পঁচিশজন। সৌভাগ্য মাধবের। তার দাঁড়ানো

জায়গায় সামনের একটা লোক উঠে যেতেই বসে পড়ল সেখানে। অনেক রাস্তা হেঁটে এসেছে—দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল! ওদিকে ঠেলাঠেলি—দরজা খুলবার জন্য আর না-খুলবার জন্য ঝগড়া—ধমকানি! মাধব বসতে পেয়েছে, নিশ্চিন্তে; একটা বিড়ি ধরালো। জংশন ষ্টেশন, গাড়ীটা কয়েক মিনিট থামবে। লোকে চা-জলখাবার খাচ্ছে। পুলিশগুলো হেঁটে যাচ্ছে প্লাটফর্মে—দেখলেই মাধবের বুক দুর দুর করে উঠছে, ঐ বুঝি আসছে তার জন্য পরোয়ানা নিয়ে। মুখখানা যতদূর সম্ভব লুকিয়ে ফেলছে মাধব। পুলিশটা চলে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। এক কাপ চা খেলে হয়। একটা লোক বেচছে এই জানালার পাশেই, কিন্তু একটা পুলিশও রয়েছে—ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। কী বলছে! মাধবকেই লক্ষ্য করবার অছিলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে নাকি! মাধবকে চিনবার চেষ্টা করছে নাকি। কপালের কাটা দাগটা মাধব লম্বা চুল দিয়ে ঢেকে মুখখানা আড়ালে আনলো। না—ওর কাছে চা কিনতে যাবে না সে, আড় চোখে দেখলো—চা-ওয়ালা চলে গেছে, কিন্তু পুলিশ দাঁড়িয়ে—এই দিকেই চাইছে। হায়-হায়—মাধবকেই খোঁজে তাহলে। মুখ শুকিয়ে গেল মাধবের—বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ! উঃ কী কষ্ট! এর থেকে ধরা পড়া ঢের ভালো—পড়ুক, মাধব ধরাই পড়ুক!

মুখখানা যথাসম্ভব লুকিয়ে মাধব ভাবছিল—একটা ছোকরা দাতন ঘষ্‌ছে গাড়ীতে বসে বসে। খানিকটা থুথু ফেললো প্লাটফর্মের উপরেই—আঃ কি করছেন। মাধব অকস্মাৎ বলে ফেললো। পুলিশটার পায়ের কাছেই পড়লো থুথু। মাধবের তাই ভয়। যদি ওকে বকতে এসে মাধবকে পুলিশ দেখে ফেলে। ছোকরা কিন্তু গ্রাহ্য মাত্র না করে আবার থুথু ফেললো—আক-আক করে শব্দ করলো! আচ্ছা বেপরোয়া লোক তো! মাধব অবাক! পুলিশটা বাধ্য হয়েই যেন সরে গেল। বাঁচলো মাধব। এতক্ষণে বললো—নোংরা হচ্ছে জায়গাটা!

—গাড়ীটা কম নোংরা? ভেড়ার পালের মতন নিয়ে যাচ্ছে ব্যাটারা। পয়সা দিয়ে মার খেতে হচ্ছে।

—সারাদিনে একটি মাত্র গাড়ী!

—কেন, ও ব্যাটাদের জন্য তো গাড়ীর অভাব হবে না! আমাদের বেলাই যত অভাব, হুঁ!

ছোকরা দাঁত মেজে লোটার জল দিয়ে আচ্ছা করে মুখ ধুলো। যায়গাটা যাচ্ছেতাই নোংরা করে দিল। কেউ কিন্তু ওকে কিছুই বলতে এল না। বেশ সাহস ওর! একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে চা কিনলো ও, মাধবও কিনে নিল এক গেলাস!

—আমাকে একগ্লাস দাও তো বাছা—বললো সেই ঝগড়াটে মেয়েটা —পার করে দাও।

বললো সেই ছোকরাকে, কিন্তু ছোকরা নিজের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—নাও-না হাত বাড়িয়ে। পার করে কি দেবে আবার!—আঃ—আরামে চা খাচ্ছে!

চা-ওয়ালার কাছ থেকে গ্লাসটা নিয়ে মাধবই দিল পার করে ওকে। ভিড়ের জন্য ওদিকের বেঞ্চের লোক কিছু কিনতে এ দিকের লোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছে। গ্লাসটা হাতে দিয়ে মাধব বলল—নাও বাছা, আর একবার গাল দাও তো!

ফিক্ করে হেসে দিল মেয়েটা। মিশিঘষা বড় বড় দাঁত, কিন্তু গালদুটি বেশ নিটোল। নাকটার ডগা একটু বেশি বর্তুল, থাঁজ হয়ে গেছে সামান্য, কিন্তু দেখতে ভালোই লাগে!

—পয়সাটা দিয়ে দাও গো—হেসেই বললো মেয়েটি—যাবে কুথাকে তুমি!

—কলকাতা! তুমি? মাধব আনিটা নিয়ে চা-ওয়ালাকে দিতে দিতে শুধুলো ওকে!

—পানাগড়! উখেনে আমার ভগ্নিপোত কাজ করে কিনা—যাব তাদের ঘরকেই!

—সর্বনাশ! পানাগড়ে তো এ গাড়ী ধরবে না!—মাধব বিচলিত হয়ে বললো!

—হুঁ! ধরবেক! আজকাল ধরছে! শুধুইলোম যে গাটসাহেবকে! উখেনে মিলিটিরি বাজার হইছে যে আজকাল।

হবে! মাধব জানে না। একটু চুপ করে থেকে বলল—ভগ্নীপোত কি কাজ করে!

—ঐ মিলিটারিদের কাজ! কি করে তা ক্যামনে জানবো। আজকাল উখেনে মিলাই কাজ! কতকি!

হতে পারে। মাধবের হাতে খুব সামান্য টাকাই আছে। একটা কাজকর্ম না হলে আর চালানো কঠিন! কিন্তু কাজ যোগাড় করতে যাওয়ায় বিপদ বিস্তর। কিন্তু মিলিটারিতে কাজ নিলে কেউ হয়তো খোঁজ নেবে না। নেবে যাবে নাকি মাধব একবার পানাগড়ে! টিকিট হাওড়া অবধি করা আছে—নষ্ট হবে। তা হোক। নেমেই একবার দেখবে মাধব চেষ্টা করে!

—আমার একটা কাজের দরকার বাছা। তোমার ভগ্নীপোত কিছু করতে পারবে কি?

—হুঁ! তা উ পারে! আমাদের গাঁয়ের চার পাঁচ জনাকে কাজ দিয়েছে। চলো কেনে তুমি!

—যাবো!—মাধব নিজেকেই শুধুলো যেন ঐ মেয়েটিকে প্রশ্ন করার মধ্যে!

—হুঁ—হুঁ—চলো! মাইরী বলছি—উ কাজ করে দিতে পারবেক! তুমি কি জাত?

—বৈষ্ণব! তোমরা কি!

—আমরা—থামলো মেয়েটা—কোহার গো—ছুটোজাত ; ঐ বাউরী টাওরীদের মতন।

—ওঃ—মাধবের মনে পড়ে গেল শৈলী, কুসুম, রেণুকার কথা। মেয়েটা বলল—চুটি আছে। ধরাও কেয়ে একটা !

—মাধব একটা বিড়ি দিল ওকে নিজে একটা ধরালো।

মেয়েটা বলতে লাগলো, চলো, মাইরী বলছি, তোমাকে গাল দিয়ে থেকে মনটা খারাপ কচ্ছে। উওকে বলে কাজ একটি আমি ঠিক করে দিবো—সরো না একটুন্। তোমার কাছে বসিগো—সত্যি এসে বস্লো মাধবের পাশেই, একটা হাঁটু মাধবের হাঁটুর তলায় পড়ল, বলছে—ও আমার ভগ্নীপোত, খুব কথা শুনে আমার—যাও তো চলো—কাজ হবেই, মাধব বিড়ি টানছে। মাঝখানে দু'টো ষ্টেশন। মেয়েটা আবার বলছে—সুখে থাকবে, মাইরী লুকটো বড্ড মাতাল, না হ'লে লুক ভালো—মদ খেয়ে সারারাত পড়েই থাকে, চেতন নাই ; ঘরে আমি ইকলা ঘুমুই। মস্ত ঘর—কুয়াটার, দু'টো কুঠুরী—তুমি একটাতে দিব্যি থাকতে পারবে! আর—বুঝলে, টাকা পয়সার ছড়াছড়ি হচ্ছে উখেনে—উড়ছে যেন! পানাগড়ে এসে দাঁড়ালো গাড়ি—মেয়েটা বললো—চলো নামি।

—না বাছা, আমি কলকাতায় যাব। বলে মাধব অন্ত দিকে চাইল।

সকাল নটা! আনন্দোচ্ছ্বাসিত সুদাম সকালে উঠেই নরুর ফটোখানা কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে—তাড়াতাড়ি এনলার্জ করে যেন ফেরৎ পাঠায়—এ কথাও লিখে দিয়েছে গৌরকে! সকাল থেকে [illegible] কাজে কামাই নেই মিলনেরও। ছড়াঝাঁট দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে স্নান সেরে ফুল তুলে পরিপাটি করে রেখেছে—কিন্তু ঘুমে চোখ দু'টো গিলে খাচ্ছে যেন। উনুন ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে আবার মন্দিরে ঢুকেছে—সুদাম ফিরে এসে ডাকলো—মা মণি!

—স্নান করো বাবা—তেল-গামছা ঠিক করে রেখেছে মিলন। সুদাস আপনার মনেই বলল—এ কাজটা অনেক আগেই আমার করা উচিৎ ছিল মা—বুড়ো ছেলে তোর ভুলে যাই!

তেল মেখে সুদাস তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে পূজায় বসবে। মিলন মন্দিরেই রয়েছে—বিদ্যাপতি পড়ছে গুণগুণ করে:—

"সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল পনি, অখির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ, ঘোর তিমির হি ঝাঁপ।"

শ্রীরাধা বলছেন, গুরুজনের নয়ন এড়াবার জন্য ঘোর তিমিরে ঝাঁপ দিয়েছি! তিমির যেন জলের স্রোত—আহা, কি উপমা! কিন্তু গুরুজনের নয়ন এড়াবার জন্য অত কাণ্ড করবার কি দরকার! গুরুজন তো বোকার একশেষ। তাদের নয়নকে এড়াতে, মনকে ফাঁকি দিতে, রাধার অত কাণ্ড করতে হয় কেন! রাধা মেয়েটা বোকা ছিল। মিলন হলে একটুও ভয় করতো না—নির্বোধ রাধা।

"কাজরে রঙ্গলি সঞে জনি রাতি।
অইসনা বাহর হোইতে শান্তি॥"—আহাঃ আহাঃ!

রাত্রিকে যেন কাজল দিয়ে রাঙিয়েছে। এমন সময় ঘরের বার হওয়াই শান্তি"—ইস্! ঘরের বার হবার জন্যে ছটফটানির অন্ত নাই, আবার শান্তি! ঐ শান্তিই তো দরকার। মেয়েরা চায় তাই—রাধাও তাই চেয়েছিল—চেয়েছিল বলেই যেতে পেরেছিল—ঝাঁপ দিতে পেরেছিল আঁধারে—মিলনও পারতো।

বইটা বন্ধ করে দিল মিলন। চুপ করে বসে রইল খানিক—কিছু ভাবছে না, কিছু না! বেশ নির্বিকার হয়ে গেছে ওর মনটা। ওর দেহের দেউলে আত্মার অধিষ্ঠানভূমি—সেখানে আত্মা যেন ঘুমিয়ে গেছে—সাড়া নাই, সাড়া নাই!

সুদাসের মন্ত্রগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। স্নান করে আসতে আসতে

আওড়ায়—গঙ্গাস্তোত্র—হরিনাম—কত কি ছাইপাঁশ। মিলনের কাণ পুরোদস্তর অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওসবে—কিন্তু আজ যেন বিরক্ত লাগছে। আত্মাটা ঘুমুচ্ছে ওর, কেউ যেন চাবুক মেরে জাগিয়ে দিতে আসছে তাকে! অন্য আর কেউ নয়—সুদাস। পরমাত্মা নিয়েই যার কারবার চলে আসছে বহুদিন থেকে! দূর্!

মিলন উঠে পড়ল। কাপড় ছেড়ে সুদাস পূজায় বসছে—মিলন ভাতের হাঁড়িতে খুব খানিক জল ঢেলে দিল গিয়ে। পূজার সময় মন্দিরেই থাকে মিলন—আজ এল না। পূজা সেরে সুদাস ডাকলো —মিলন!—সুদাস বিস্মিত হচ্ছে মিলনের এখানে বসে না থাকায়!

—"যাই"!—"যাই বাবা" কথাটা বললো না মিলন—যা ও এই দীর্ঘকাল বলে আসছে।—কেন? সুদাস ভাবছে—মা'টির আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সারাটা রাত কেঁদে কাটালো কাল! কারনটা খুবই স্পষ্ট! সুদাস গৌরের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে কালই ঝগড়ু সাঁওতালকে কাঁকরতলা পাঠিয়েছে নন্দকিশোরকে আনবার জন্য। মিলন নিশ্চয় ধরে নিয়েছে যে সুদাস মিলনকে বিদায় করতে চায়। তাই কাল নরুর জন্য শোকটা অতখানি প্রবল হয়েছিল। না—কালইবা শুধু কেন! রোজই হয়তো যায় ওঘরে। যায় বইকি, কাল সকালেও তো সুদাস ঐ সিঁড়ি থেকেই মিলনকে নামতে দেখেছে। সাড়ীখানা হয়তো বারন্দায় টাঙানো ছিল। মাধব তাই টেনে পরেছিল। এর জন্য মিলনের মত সতী মেয়েকে সন্দেহ করা পাপ!

মিলন আসছে। এক গ্লাস সরবৎ করে রেখেছিল—হাতে নিয়ে আসছে।—পূজোর সময় থাকলিনে যে মা? গেলাসটা হাতে নিয়ে বলল সুদাস।—মন ভালো নেই বাবা। ঠিক আজকার দিনটিতে তোমার ছেলেকে উপর থেকে নামানো হয়েছিল, ঐ যে ঘরে আমি হতভাগী শুয়ে থাকি। আর উপরে উঠলো না বাবা···। কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য কারুণ্য মিলনের।

কোন্ দিন নরুকে দোতালা থেকে নামানো হয়েছিল, ঠিক মনে পড়ে না সুদাসের, কিন্তু মিলন মনে রেখেছে—মনে রেখেছে সেই একরত্তি পনের বছরের মেয়ে—আহা-হা—মা-মা-মা।

গেলাসটা রোয়াকে নামিয়ে—রোয়াকের নীচে দাঁড়ানো মিলনের মাথাটা একেবারে কোলের মধ্যে গুঁজে নিল সুদাস—মনে রেখেছিস মা—এমনি করে মনে রেখেছিস—! এমন নাহ'লে সুদাসের বৌমা!

আনন্দ আর অহঙ্কারের বেদনায় বৃদ্ধ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো—টপ্ টপ্ চোখের জল পড়ছে মিলনের পিঠে—চোখের ঝাপসা দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে!

আর মিলন! সুদাসের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে হাসির নিদারুণ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে—আকুল কান্নার মতই কেঁপে উঠছে। হাসির শব্দ না বেরয়—তার জন্য আঁচল চাপা দিয়ে!

—প্রভুর কাছে বোস্ মা, ঠাকুরের কাছে বোস্—উনি তোর স্বামীকে ফিরিয়ে দেবেন—দেবেনই!

সুদাস কোনোরকমে বললো ভাঙা গলায়। মিলন হাসিটাকে কান্নায় রূপান্তরিত ক'রে মুখ গুঁজেই বলল—সরবৎ খাও বাবা! ছবিটা কবে আসবে!

—দিন সাতের মধ্যেই! গৌরকে লিখে দিলাম। নরুর বন্ধু গৌর—ঠিক পাঠাবে! সুদাস সরবৎ খেতে পারছে না—গিলতে পারছে না। কিন্তু খেতেই হবে—না হ'লে মিলন দুঃখ পাবে যে—নরুর মিলন —সুদাসের মানস দুলালী মিলন!—সুদাস খেতে লাগল সরবৎ!

বাইরে কে ডাকছে। সুদাস উঠে গেল দরজা খুলতে। মিলন এক লাফে রোয়াকের উপর উঠে মন্দিরের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ করে দিল—তারপর হাসির ধমকে ফেটে পড়ল!

দরজা খুলতেই ঢুকলো নন্দকিশোর। রোদে রাস্তা হেঁটে এসেছে!

ঘামে ভিজে লংক্লথের কামিজটা পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। পায়ের রং তামাটে—মুখে মেছেতার দাগ!

সুদাসকে প্রণাম করে বলল—লোক পাঠালে কাকা—ভাবলুম, কারো অসুখ বিসুখ নাকি!

—এসো! অসুখ নয় বাবা, দরকার আছে!—এসো,—সুদাস ঘরের বারান্দায় নিয়ে এল নন্দকে! মিলন মন্দিরের দরজা দিয়েছে—ডাকলো না! আহা, অভাগী! মনের ব্যথাটা ভগবানের কাছে বসে একটু জুড়োক! সুদাস নিজেই একটা মাদুর পেতে দিল বারান্দায়—বসো!—ঘরে কেউ নাই নাকি কাকা!

—আছে। মা মিলন আছে আমার! ধ্যানে বসেছে ঠাকুরের কাছে। একটু জিরিয়ে হাত-পা ধোও। বড্ড রোদ বাবা—আর একটু সকালে এলেই পারতে!

—দোকানের ব্যবস্থা করে আসতে হোল তো!

—ওঃ—সুদাস তামাক সাজতে বসলো নিজেই।

—আচ্ছা! আমি সেজে দিচ্ছি কাকা! নন্দ ব্যস্ত হ'য়ে বললো!

—থাক—থাক্—তুমি রাস্তা হেঁটে এলে। বসো!—হুঁকোয় কলকেটা চড়িয়ে সুদাস করবী গাছের কাছে এসে দাঁড়ালো। ভাবছে। আকুল, অধীর হয়ে ভাবছে। যে-জন্য নন্দকে ডাকা, সেতো আর সম্ভব নয়। মিলনের কণ্ঠিবদল করানো অসম্ভব। ঐ পতিপ্রাণা মেয়ে, ও কখনো রাজি হবে না। কি বলে নন্দকে ফেরানো যায় এখন!—সুদাস ভেবে আকুল হচ্ছে!

নন্দ সত্যি ক্লান্ত! একটা গামছার পুঁটুলিতে কাপড় জামা বেঁধে এনেছে—গামছাটা খুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো নিজেকে। সুদাস একটু বাইরে গেলে সে একটা বিড়ি খেতে পারে। সুদাসের সুমুখে বিড়ি খাওয়া চলে না। সুদাসের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা

করেই এত তাড়াতাড়ি এসেছে ও। সুদাস ওকে ঘরের দেখাশোনার ভার দিতে পারে—মন্দিরের সেবাইত করতে পারে—শিষ্য-সেবকদের কাছে টাকা আদায় করতে পাঠাতে পারে। যুদ্ধের বাজারে গাঁয়ের দোকান চালানো মুস্কিল। মাল পাওয়া যায় না—তার উপর মন্বন্তর চলছে। লোকে চাল চায়—ডাল চায়—খাবার জিনিষই চায় সৌখীন জিনিষ কেনা প্রায় বাদই দিয়েছে সব—আর যা দাম হয়েছে ওসব জিনিসের। যাই হোক, সুদাস কি জন্ত ডেকেছে—নন্দ জানে না—কিন্তু আশা ওর অনেক! সুদাসের এই বিগ্রহের পূজারী হতে পারলেই অনেক প্রণামী আর দক্ষিণা পাওয়া যায়। নন্দ আশায় এসেছে।

পনর মিনিট ধরে হাসলো মিলন—হাসি কিছুতেই থামতে চায় না। পুরুষগুলো এমন বোকা! উঃ! আঁচল দিয়ে মুখটা মুছলো—হাসির চোটে চোখে জল আর মুখে লালা গড়িয়ে গিয়েছে ওর! কিন্তু কে এল আবার। কাকে সুদাস অত খাতির করে বসাচ্ছে! জানবার কৌতুহলটাও অদম্য হয়ে উঠলো ওর—অথচ বেরুতে পারছে না—হাসির দমক এখনো মুখখানা রঞ্জিত করে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—সুদাস দেখতে পাবে। নাঃ কাঁদতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে কাঁদবে! মনটা একটু দুঃখিত না করলে তো কান্না পাব না—নকুল কথাই ভাববে নাকি? আবার হাসি পেয়ে গেল মিলনের। মাধবের কথা ভাববে? ফের হাসি পাচ্ছে। মহা মুস্কিল, নির্বোধ সুদাসের কথা ভাববার মত কিছু নাই—তাহলে? মুখখানা একটু করুণ না করে বেরুতে পারছে না মিলন! বাপের বাড়ীর কথা ভাবা যাক্—কত দিন যায় নি। দাদাও তো আসেনা একবার বোনকে দেখতে!—রাগ আর অভিমান হয়ে গেল দাদাবৌদির উপর। মুখটা ঠিক করুণ কান্নাভরা হচ্ছে না। আর কিন্তু না বেরুলে উপায় নাই। ঘরে লোক এল—মিলন আর মন্দিরে

ঢুকে থাকতে পারে না। উঠে মিলন দরজা খুলতে গিয়ে মুখখানা যথাসম্ভব কান্নাকান্না করে তুলতে চাইছে—দরজা খুলেই নদীর দিকে তাকালো। তীব্র তীক্ষ্ণ জলস্রোত-উত্তাল-আবর্ত্তসঙ্কুল—তমাল গাছটার কাছাকাছি এসেছে—সর্ব্বনাশ। বান উঠবে নাকি উঠোন অবধি! উঠলে ঘর ভেসে যাবে, বিগ্রহ ডুবে যাবে—মিলনও যাবে ডুবে—যদিও সে রকম কাণ্ড ঘটবার কোনো সম্ভাবনা নাই—তবু হতে তো পারে। দুপুর রাতে যদি বান আসে! হাসিটা থেমেছে মিলনের এতক্ষণে। সুদাস ওকে বেরুতে দেখে বলল—নন্দ এসেছে মা—ওকে একটু হাতমুখ ধোবার জল দাও—আর এক গ্লাস সরবৎ করে দাও—যাও মা—কেঁদো না—! সুদাস মিলনের মুখপানে তাকালো। থম্ থম্ করছে মুখখানা। বিস্তর কেঁদেছে মিলন—আহা কচি মেয়ে!

নিশ্বাস ফেলে সুদাস হুঁকো হাতে নিজের ঘরটায় ঢুকলো গিয়ে। মিলন ঐখান থেকেই তাকালো নন্দর দিকে! নন্দ উঠে কুয়োতলার দিকে যাচ্ছে—হাতমুখ ধোবে! গায়ের কামিজটা খুলে রেখেছে। আধময়লা ধুতিটা হাঁটু অবধি—পায়ে অপর্য্যাপ্ত কাদা—জুতোজুটি হাতে করে বয়ে এনেছে বরাবর—তাতে কাদা নাই! চুলগুলো নন্দর একেবারে সিকিইঞ্চি করে ছাটা—মস্ত একটা টিকি মাথার মাঝখানে!

পিছন দিকটা দেখছে মিলন—আস্তে নেমে ঘরে এল। নন্দ জল তুলে মুখ ধুচ্ছে। দাঁতগুলো বড় বড়—উঁচু। দাড়ী কামায় নি কদিন বোধ হয়—কিন্তু বুকের ছাতিটা খুব চওড়া—লোকটা শক্তিমান—সন্দেহ নাই। হাতগুলো গাঁঠ গাঁঠ আর রোমশ—বাহুর গুলি দুটো বেশ দেখা যায়। গেলাসের সরবৎ ঢালা-উব্‌রা করতে করতে মিলন দেখে নিল নন্দকে—দেখতে মন্দ কি! বেশ!

সরবৎ তৈরী হয়ে গেছে মিলনের, কিন্তু নন্দ বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালতে আরম্ভ করলো—স্নান করছে। করুক! বাইরে একটা

আসন পেতে তার সামনে গেলাসটি রেখে মিলন একটা রেকাবী চাপা দিয়ে রেখে দিল—স্নান করে নন্দ খাবে! ঢুকলো গিয়ে রান্না ঘরে! ভাতের হাঁড়ি সরিয়ে রান্না চড়ালো কি একটা—এমন লঙ্কা পুড়িয়ে দিলো যে সারা বাড়ীটা লঙ্কার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কুয়োতলায় নন্দ কাসছে—ভীষণ কাসছে! সুদাস ঘরে আছে, টের পেল না। কাশতে কাশতে নন্দ বলে বসলো—উরে বাবা, ইকি লঙ্কা! লঙ্কার ধূমো দিয়েই তাড়াবে নাকি বৌদি!—উরে বাবা, উঃ—খক্ খক্! .

—"বৌদি"—মিলন ওর বৌদি হয় নাকি? কে জানে! হয় হয়তো। লঙ্কাবাণ অকস্মাৎ সম্বরণ করলো মিলন! হাসি পাচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখলো একবার কুয়োতলায়। নন্দ কেশে খুন! আহা, এমন করে লঙ্কার ধোঁয়া কেন দিল মিলন। নতুন লোক, কি যে মনে করছে!

নন্দ কোনোরকমে নিজকে সামলে কাপড় ছাড়লো, তারপর মন্দিরে গেল প্রণাম করতে! মিলন ইতিমধ্যে শোবার ঘরে এসে শাড়ীটা বদলে নিল—যেটা পরে ছিল, সেটা ছেঁড়া আর শাদা রংএর। এবার একটা তাঁতের বোনা চেক পরলো—ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিজকে দেখলো—বেশ লাগছে।

পান নাই, ডুকুচি সুপুরী কেটে রেখে দিল গেলাসটার কাছে—সরবৎ খেয়ে মুখে দেবে। সুদাস কি একটা হিসাব দেখছিল চোখে চশমা এঁটে—ওর কাছে এসে বলল—উ কে বাবা?

—সম্পর্কে ভাইপো হয়—নরুর থেকে বছর খানের ছোট—বলে সুদাস তাকালো মিলনের পানে!

—কি জন্তে এসেছে?

—আমিই আসতে বলেছিলাম মা। ছেলেটা কেমন, দেখি আগে, তারপর কথা···!

"উঁ" মুখ ফিরিয়ে মিলন ঠোঁটদুটো উল্টালো। চলে এলো সুদাসের

কাছ থেকে! নন্দর ছাড়া ভিজে কাপড়খানা তুলে উঠোনে রোদে শুকুতে দিচ্ছে—নন্দ পিছন থেকে বলল—

—আমি-আমি দিচ্ছি শুকুতে বৌদি!

—আমিই দিলাম—জল খান গে! বলে মিলন ঘোমটার ভেতরেই হাসলো একফোঁটা! নন্দর উচিত ছিল কাপড়খানা মেলে দিয়ে যাওয়া। যাকগে, নাহয় বৌদিই মেলে দিল। বেচারা আধমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে রোয়াকে উঠে সরবৎ খেল—মিলন ততক্ষণ রান্নাঘরে! নন্দ সুপুরী চিবুতে চিবুতে বাইরের দিকে গেল বিড়ি খেতে। এ গাঁয়ে ও অনেকবার এসেছে তবে নরু মারা যাবার পর এবাড়ীতে আসে না—আসতে সঙ্কোচ বোধ করে। বৈঠকখানার পাশে দাঁড়িয়ে চোঁচা বিড়ি টানছে—মিলন এঘর ওঘর করতে দেখলো কাণ্ডটা। কাকাকে লুকিয়ে বিড়ি খায়। দুনিয়ায় লুকোচুরি খেলাটাই লোকের সব থেকে বেশী আয়ত্তে! শ্রীকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলতেন—সুদাস খেলে। মাধব খেলে গেল, মিলনও আরম্ভ করেছে। আবার ঐ নন্দগোপাল নাকি—উনিও কম যান না। মুখ মটকে হাসলো মিলন!

বিড়ি টেনে আবার বারান্দায় এল নন্দ। সুদাসও এসে বসেছে বারান্দায়। নন্দ বলল—আমাকে দিয়ে কুনো কাজ হবেক কাকা? আমি তো একটা মুখ্যু মানুষ!

—মানুষকে দিয়ে আবার কাজ হয় না বাবা। মুখ্যু হয়েও নরু যদি আমার বেঁচে থাকতো!

—ই। অত লিখাপড়া শিখলো, খামুখা! আধবিলাতে যাবার লেগেই শিখেছিল।

মেয়েলী ঢংএর কথা—সুদাসের অন্তর এতে প্রসন্ন হবে না—জানে মিলন। জানালায়, চোখ রেখে শুনছে। সুদাস বলল—শিখেছিল বাবা সবাই শেখে, মরার কথা কি ভাবে কেউ!

—হুঁ—তা বটে। তবে কি না…তুমি বুড়ো মানুষ ইকলা রয়ে গেলে…।

সুদাস চুপ করে রইল। হুঁকোতে কলকে দিয়ে এল মিলন! সুদাস টানছে বসে বসে। কয়েক টান টেনেই হুঁকো রেখে বাইরে গেল—গত কালের মত এক ছেদ ভাগবত পড়ে আসবে। বেরুবা মাত্রই নন্দ হুঁকোটা তুলে চড় চড় করে টানতে লাগল। ধোঁয়ায় মুখচোখ দেখা যায় না—যেন অমৃত পান করছে! আকালের বাজারে ভাতের কেনও কেউ এমন করে গেলে না! হাসছে মিলন—খিক খিক্।

—হাসছো বৌদি! সেই বেরিইছি সকাল বেলা—রাস্তায় কুথাও তামুক খাই নাই—পরানটো বেরিয়ে গেইছিল একবারে। তামুকটো কুথাকার বৌদি—বেশ গন্দ—গয়ার নাকি?

—বিষ্ণুপুরের—মিলন উত্তর দিলে—নাকি বালা খানার—কে জানে!

—তা হবেক! ভারী সুন্দর গন্দটি! বিড়িতে সানায় না বৌদি—তামুক খেকো লোক—বড় বড় দাত নন্দর হাসিতে বেরিয়ে পড়ছে! মাড়িটাও বেরুচ্ছে। হাসি অমন কুচ্ছিত হয় নাকি কারো! মিলন পূর্বে দেখে নি। কিন্তু ছোকরা আশ্চর্য্য যোয়ান। মিলনকে পিষে মেরে ফেলতে পারে বোধ হয়—এমন যোয়ান। খালি গায়ে বসে আছে যেন একটা বুনো মোষ—গা-ময় লোম—পিঠে, কানে, হাতের গুলোতে! গায়ে যার অত লোম সে অমন বদখৎ করে চুল কাটে কেন! রামচন্দ্র! যেন কদম ফুলটি।

মিলন রান্নাঘরে ঢুকে তরকারী সাঁতলাচ্ছে—নন্দ হুঁকো হাতে এসে ঢুকলো! ভয় পেয়ে যাচ্ছে মিলন—যে রকম অসুরের মত চেহারা! মিলন মাথায় ঘোমটা টানলো!

—কী রাঁধলে বৌদি! মাছ আমি খাই ভাই বৌদি, আর পেঁয়াজ! নিরামিষ-খিরায় নাই—যা পাই খাই।

—টিকি রাখেন কেন তাহলে? মিলন বিদ্রূপ করেই বলল কথাটা আস্তে।

—টিকি না রাখলে চলে না বৌদি, জানলে—ভদ্দর লুকের মেয়েদের হাতে চুড়ি পরাতে হয়। কানে দুল—কলগুলটের দুল পরাতে হয়—অনেক লুকের ঘরের বৌঝির সঙ্গে কথা কইতে হয়—টিকি ভারী ভালো জিনিস বৌদি—মাইরী বলছি!

লুকোচুরী! রসিকতা!—মিলনের মনটা রীরী করছে! কিন্তু ও ঠাকুরপো—কিছু বলা চলে না! মিলন তরকারীটা নামিয়ে এঘরে চলে এল। এই কদিন থেকেই মিলন নন্দকে ভালবাসার অভিনয় করেছে, এখনো করছে—তবু সুদাস কেন নন্দকে ডাকলো,—ভাবছে মিলন, নন্দ রান্না ঘরেই রয়েছে এখনো—করছে কি! মিলন আবার গিয়ে দেখল—কুলুঙ্গীতে লুকোনো বিদ্যাসুন্দর পুঁথীখানা ও বার করেছে—হুঁকোহাতে পাতা উল্টাচ্ছে। মিলনের রাগ হয়ে গেল অকস্মাৎ।

—ছাড়ুন—এসবে হাত দেন কেন?—কেড়ে নিল মিলন পুঁথীটা।

—দেখি—দেখি—দেখি বৌদি! পড়তে আমি জানি না বৌদি—জানি না—সত্যি বলছি!

—তা হলে দেখে কি হবে! যান—ওঘরে বসুন গিয়ে—বলে মিলন পুঁথীটা নিয়ে বেরিয়ে আসছে—নন্দ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো মিলনের গায়ে—দেখবো, দেখবোই আমি।

হুঁকোটা ছিল হাতেই, এক টুকরো আগুন পড়ে গেল মিলনের গায়ে!

—উঃ মাগো। পুড়িয়ে মারলো—সজোরে অতবড় জোয়ান মানুষটাকে ঠেলে দিয়ে মিলন আগুনটা ঝেড়ে ফেললো—তার পর গুরু যন্ত্রনায় মুখ বুজে বইটা নিজের ঘরে এনে বাক্সে বন্ধ করে দিল!

—পুড়ে গেল বৌদি—আহা-হা! কি যে করলুম! কাঁচা সরষের তেল লাগাও বৌদি—জলন যাবে।

—থাক্—মিলন সটান বেরিয়ে এল রাস্তায়। সুদাস পুঁথিটা খুলেছে মাত্র—মিলন গিয়ে বলল—ঘরে এস বাবা— !

—কেন মা ? সুদাস ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলো !

—কেন কি আবার ! একলা ভয় করছে আমার ! চলো। ঘরে চলো ! রূঢ় কণ্ঠে বলল মিলন।

রাধাও ছিল ওখানে—উচ্চ হেসে বলল—বাপ্ রে—বৌদি, তুই এতো ভকক ! দিনের বিলা !

—হুঁ—ভকক !—বলে মিলন সুদাসের কোঁচাটা ধরে টেনে নিয়ে এল তাকে বাড়ীতে ! নন্দ তখনো মনে মনে আপশোষ করছে উঠোনে দাঁড়িয়ে।

* * * *

সুদাসকে ঘরে এনে মিলন উঠোনের দিকে টেনে নিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করছে ; যেন সুদাস আবার পালিয়ে যাবে।—এমনি ভাবখানা ! সুদাসকে দেখে হুঁকোটা হাত থেকে নামানো উচিত, কিন্তু নন্দ যেন ভুলে গেছে সেকথা। দরজা বন্ধ করে শ্বশুরকে বারান্দায় এনে বসিয়ে দিল মিলন।

—পুঁথী পড়তে হয়, ঘরে বসে পড় বাবা, এমন করে আমায় একলা ফেলে যেওনা তুমি।

—না মা, না মা, না—ভাবলুম তোর রান্নাটা হোক—সুদাসের কণ্ঠস্বর অনুতপ্ত—অপরাধী !

—হয়ে গেছে রান্না আমার। খেতে বসো—বলেই মিলন পায়ের শব্দ করে রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে।

এতক্ষণে নন্দর খেয়াল হয়েছে, যে, হুঁকোটা তার হাতে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল।

সুদাস বসে বসে ভাবছে—সে ভুল করেছে। মিলন কোনোদিন কণ্ঠিবদল করবে না, কারো সঙ্গেই না ! নকুকেই ভালোবাসে—নকুর স্মৃতি নিয়েই কাটিয়ে দিতে চায়। নন্দকে কেন যে সুদাস ডাকলো ! ছিঃ

ঃ ! এখন নন্দকে ফেরাবে কি বলে ! কি ভক্ত ভেকেছে তা অবশ্য নন্দকে খনো বলা হয়নি—কিন্তু নন্দ কি আন্দাজ না করেছে ! এখন কি বলবে ন্দকে !

সদর দরজায় করাঘাত হচ্ছে—এই বৌদি—দরজা খুল্—খুল্ বলছি চাপ চাস তো !—রাধা এসেছে। মিলন হাসিমুখে গিয়ে দরজা খুলে দল। রাধা ঢুকেই বলল—কোন্ ভূত ধরতে এসেছিল লো ?

—ভূত না, রাক্কস ! বলে হাসলো মিলনও ! রাধা আর চ'পা এসেই কানে কানে বলল···দেখ্ বলেছিলুম যে লুকচোর চোরা চাউনি···মাইরী বৌদি···আমি লুক চিনি ! কি বলেছিল কি লো ? হঠাৎ উঠোনে নন্দকে দেখে রাধা শব্দ করে উঠলো···উমমা, নন্দদা যে ! ভাল আছ ! কখন এলে ভাই ?

—এই তো সকালে এলোম ! ভাল আছ ?

—হুঁ—বলে রাধা রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে মিলনের সঙ্গে। বলল, —সেই লুকটো কৈ লো বৌ—কুথা ?

—নাই ! কাল সকালেই চলে গেছে···মিলন ভাত বাড়ছে শ্বশুর আর নন্দর জন্মে !

—তাহলে রাক্কস এই নন্দ ছোঁড়া ? লয় ! হুঁ ! তুর বৌদি ভ্যালা জ্বালা হোল—অত সুন্দর হইছিস কেনে ?

—কি জানি !···অত্যন্ত বিষন্ন কণ্ঠে বলল মিলন ! গলার আওয়াজটা শুনে রাধার খুবই দুঃখ হচ্ছে ! এরকম প্রশ্ন তার মিলনকে করা উচিৎ হয় নি ! মিলন ভাত দিয়ে এল ওঘরে।

—উ ছোঁড়া কি জন্যে এলো লো বৌদি ? মতলব কি উওর ? এমন কি সম্পর্ক তোদের সঙ্গে ?

—কি জানি ! বাবা আসতে বলেছিলো···এসেছে !

—মালাচন্দন করাবার লেগে লয় তো ?

—যাঃ কাজিল ! মালা চন্দন অত সস্তা কিনা !

—তুই বললেই সস্তা হয় !—বলে রাধা খেতে-বসা নন্দর পানে চাইল একবার জানালা পথে। তার পর বলল—বেশ যোয়ান আছে মাইরী ; হলে কিন্তুক মন্দ হয় না—করবি বৌদি ? কন্তি বদলের জন্তই এসেছে ছুঁড়া !

—তুই করগে না ! একটা করেছিস, আর একটা কর গিয়ে !

—তা নিয়ম থাকলে মাইরী আমি করতুম ! বেটা ছেলেরা দুটো তিনটে বিয়ে করে কেমন—আমাদেরও যদি—

—থাম্, মুখপুড়ি কোথাকার—মিলন ধমক দিল ওকে !

—উর তুলিয়া সুখ নাই লো বৌদি ! তুই তো কিছু জানলি না···বলছি, কর ছোঁড়াকে বিয়ে···গায়ে ক্ষ্যামতা আছে।

মিলনের হাসি পাচ্ছে রাধার কথা শুনে কিন্তু গম্ভীর হয়েই বলল—চুপ কর রাধা !

—হুঁ, করছি চুপ ! সেই ছোঁড়াটো চলে গেল কেনে লো ? রাজি হলি নে তুই—নাকি ?—বল সত্যি !

অন্তরের অস্থিটাকে আড়াল করার জন্ত মিলন পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ! কাশফুলের গাছগুলো নদীর বানে প্রায় ডুবডুব—মাথার শীষটা কোনরকমে জাগিয়ে রেখেছে—আর একটু বান বেশি হলেই ডুবে যাবে। ওরা ডুবে যেতে পারবে, নদীর বান ওদের পরম স্নেহে আলিঙ্গন করছে !

—বল না বৌদি ? বেশ কাল কোকড়া চুল ছিল—মাথায় চূড়ো বেঁধে দিই সাজাতিস। রাজি হলিনে কেনে লো !

—যাঃ ! কোথাকার কে তার ঠিক নাই। বললেই হোল নাকি রাজি !

—উম্মা, দেখতে যে বেশ লো ! আমি হলে কিন্তুক তাই রাজি হয়ে যেতুম ! লুকটো রসিক আছে বেশ !

মিলন উত্তর না দিয়ে ওঘরে ভাত তরকারী দিতে গেল। রাধা

হাসছে আপনার মনে। বৌদিকে বেশ নাকাল করতে পারছে ও। কিন্তু কেন বৌদি রাজি হোল না—নাকি ওসব কথা কিছু হয়ই নাই?

* * * *

নন্দ বলছে—বান যদি বেশি বাড়ে কাকা। তমাল গাছের গোঁড়াটো খেয়ে গেইছে। গাছটো টিকবে না ইবছর আর—নাকি! ইদিকে ঠাকুর ঘরের ভিত্‌টোও তো আলগা হইছে।

—হুঁ···সুদাস একটা হুঁ দিয়ে সমর্থন করলো শুধু। এসব কথা এখন আর ভাবছে না সুদাস···ভাবছে···নন্দ গিয়ে মিলনকে কিছু এমন বলেছে যাতে মিলন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

নন্দকে আনিয়ে ভাল করে নি সুদাস। ওকে এখন বিদায় করবে কি বলে! নন্দ কিন্তু বলেই চলেছে আত্মীয়তা জানিয়ে—গাঁয়ের কেউ তখন চাঁদা দিলে না—বাঁধটো যদি হয়ে যেত তাহলে এ বিপদ হ'ত না—লয় কাকা? আখুন আর কি করা যাবে—মন্দিরটোকে তো রাখতেই হবে। তমাল গাছটো না হয় যাক গো। ঝুলনের পূজো আসছে—কি করবে কাকা?

—দেখি—বিরক্তি বোধ হচ্ছে সুদাসের। কিন্তু উপায় নাই। আত্মীয়ের এই অত্যাচার সইতে হবে।

মিলন তরকারী দিয়ে নীচু গলায় বলল—কিছু তুমি খাচ্ছ না বাবা!

—খাচ্ছি তো মা!···সুদাস তাকালো মিলনের ঘোমটা ঢাকা মুখের পানে। শীতাভ দুটি চোখ—বয়সের আধিক্যে ক্ষীণদৃষ্টি···তবু কতো সুন্দর! স্নেহে, করুণায় সহানুভূতিতে যেন যুবকের চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে!—

—খাচ্ছি মা মণি, তুই ব্যস্ত হোস্ নে!

মিলন চলে এল আস্তে! ঘোমটার ভেতর ঢাকা ওর মুখখানা নন্দও দেখেছিল—বলল—ডাল একটুন দাও বৌদি। —বৌদি রাঁধে কিন্তুক ভারী সুন্দর কাকা!

সেই একঘেয়ে প্রশংসা। বিরক্তিতে মুখ কুঁকড়ে উঠেছে মিলনের। রাধা দেখে বলল—আহা-হা! অমন করে মানুষকে মজাতে নাই বৌদি, বুঝলি! মজিয়ে মজা দেখা ভালো নয়।

বাটিতে ডাল নিয়ে আসতে আসতে মিলন একটা রূঢ় ভঙ্গি করলো মুখের। ডাল ঢেলে দেবার সময় নন্দর পানে একচোখে চাইল এক লহমা—তারপর চলে এল!

মজিয়ে মজাই দেখবে সে এবার! দেখবে পুরুষ কত বড় ভীতু, কতখানি নপুংসক। রান্নাঘরে এসে মিলন ঠোঁটের কঠোরতাটা হ্রাস করার চেষ্টা করছে, রাধা বলল হেসে,—হোল কিলো বৌদি! ছোঁড়াটাকে মরমে মেরে দিলি যে একদম!

—ফাজলেমী করিস না রাধা! কাউকে মারতে আমার দায় পড়ে নাই!

—হুঁ—তা বুঝলুম! ই কিন্তুক বৌদি সেই চাচর চুল মুহান্তর মতন লয়—ই ছুঁড়া বজ্জাৎ। সামালিস।

—আচ্ছা! বলে মিলন পিঠের কাপড়খানা সরিয়ে একটা গামছা টেনে রাধার হাতে দিয়ে বলল—দেতো পিঠটা পুঁছে। ঘামে সাঁতরে গেলাম একেবারে। রাধা ওর চাঁপা রংএর পিঠটায় গামছা বুলিয়ে বলল—বাবা, কি মিষ্টি রং লো তুর বৌদি···যেন সোনা!

—হোক্ বকিস না! গা'টা ভাল করে মুছে নিয়ে মিলন শাড়ী গুছিয়ে আবার গেল ওধারে।

কিছু দিতে হবে কি না ওঁকে শুধুও তো বাবা!

—দেখ কাকা, আমি ঠাকুর পো, আমার সঙ্গে বৌদি কথা বলছে না ···নন্দ অভিযোগ করলো!

—কথা বল্লি তো কি হোল মা···নরুর চেয়ে ছোট নন্দ! সুদাস মধ্যাহ্ন হচ্ছে!

—দরকার হলে বলবো বাবা···বলে মিলন চলে এল এঘরে!

—দরকার শিগগীর হবে লো ছুঁড়ি—দেখিস। উ তুখে না নিয়ে ছাড়বে না! বাবা! যা চাইছে কটমট্ করে! যেন চুষে খাবে। অনেক মেয়ের দফা রফা করেছে উ—বৌদি—বুঝলি!

রাধার কথাগুলো গ্রাহ্য না করে মিলন নিজের জন্ম ভাত বাড়তে বসল —রাধাকে বলল আয়, একসঙ্গে খাই! অনেক কটা ভাত আছে! মাছও আছে রাঁধা, খাবি লো?

—দে—তুর সঙ্গে খাবো—তা আবার শুধুবি কি:—বাড়্ ভাত! রাধা বসে পড়লো!

সুদাসদের খাওয়া হয়ে গেছে! নন্দই তামাক সেজে দিচ্ছে—কলকেটা নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে বলল—আগুন একটু দাও বৌদি, ও খেতে বসেছ নাকি!

মিলন খেতে বসে নাই। চিমটেতে করে আগুন তুলে দিল একটু। নন্দ হেসে বলল,—"অমিত্তি" বলো বৌদি। হাতে হাতে আগুন নিতে নাই। নয় ভাই রাধা? সত্যি নয়?

—তোমাকেই "অমিত্তি" বলতে হয়। যে আগুন লেয় সেই বলে—বৌদিতো দিচ্ছে। তুমিই লাও "অমিত্তি" বলে—রাধা জবাব দিল কপাট্টার।

কিন্তু কারুকে কিছু বলতে হোল না—মিলন চিমটা সমেত আগুনের টুকরো টুকু নামিয়ে দিলো মেঝেতেই। নন্দ পরিহাস করছে—বৌদির রাগ যেন কাঁকড়া বিছে, বাপ্! জলুনে রাগ রে বাবা! গা'টা জলছে নাকি বৌদি! জলছে আখুনো! মাইরী জলাই?

—যান্! অসভ্য কোথাকার! মিলন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মাথার কাপড়টা খুলে গেল ওর। নন্দ থিয়েটারে দেখেছে রাজপুতানীকে অপমান করলে ঠিক অমনি ভঙ্গী হয় তার! জোঁকের মুখে চুণ পড়ার মত মুখ চুপ করে নন্দ এঘরে উঠে এল। কলকেটা

হুঁকোয় বসিয়ে কয়েকটা টান দিল—আগুন ভাল ভাবে ধরলে সুদাসের ঘরে গিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল,—আমাকে কি জন্যে ডেকেছ কাকা, বল—আমার নানা কাজ; থাকতে তো পারবো না—যেতে হবে আজই—।

—বলবো। যাও এখন শোও গিয়ে একটু। বলে সুদাস হুঁকো টানতে লাগলো!

—কি কথা-না শুনলে মন ঠিক থাকছে না কাকা! বলো, শুনেই শুবো গা আমি!

সুদাস বিপদে পড়ে গেল। কি বলবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না; বলল—বড্ড ঢুলুনি আসচে রে! একটুন শুই। কথা এমন কি আর। শুনবি বিকেল বেলা!

সুদাস হুঁকোটা ভাল করে না টেনেই রেখে দিল—চোখ বুঝলো! নন্দ নিরুপায় হয়েই যেন বৈঠকখানায় শুতে চলে গেল—কিন্তু রাগে আর অপমানে মন ওর গুমরাচ্ছে! এতবড় আস্পর্দ্ধা! ধমক দেয় ঐ সিদ্দিনকের ছুঁড়ি! আচ্ছা দেখবো কত তেজ!

নন্দ চুপচাপ শুলো। দিনে ঘুমানো ওর অভ্যাস নাই—পথ হাঁটাও ওর অভ্যাস আছে। এমন কিছু বিশেষ ক্লান্তিও অনুভব করছে না। কিন্তু কি করা যায়! বৌদি বলে একটু রসিকতা করতে গেল, তা ফল হোল উল্টা! ব্যাপার কি! এমন করছে কেন নন্দকে! নন্দ তো অনেক মেয়েকে দেখে এসেছে এই পঁচিশ বছরের জীবনে! ইনি আবার লেখাপড়া জানা মেয়ে হুঁ! বলে সেই "প্যাটে খিদে মুখে লাজ"—কুড়ি বছরের ধাড়ি! উনি যেন সতী-সাবিত্রী আর কি! বলে অসভ্য! উঃ! মুখটা বালিশে গুঁজে শুয়ে রইল নন্দ—যেন ঘুমুচ্ছে! কিন্তু ঘুমুচ্ছে না ভাবছে!

—তু কিন্তুক ভারী বজ্জাৎ হয়ে উঠলি বৌদি—দিদি তো দুকটোর দফা ঠাণ্ডা করে! হেসে বলছে রাধা!—কেন?—মিলনও হাসিমুখেই প্রশ্ন করছে ভাতে ডাল মাখতে মাখতে। রাধা ভাতগ্রাসটা গিলে বলল,

-কেন্নে কি লো! উকি আর ঘুরে ঘাস খাবেক! ঐ ধুম্‌কানিতে হয়ে
গল—কটি বুলল না করে নড়বে না!

—যাঃ যত সব···

—মাইরী বৌদি! ব্যাটাছেলের ঐ দস্তুর। ঐ ধুমকানিতে তোকে
ালবেসে ফেলবেক উ দেখিস!

মিলন কোনো উত্তর না দিয়ে ভাত মাখতে লাগলো। একটা অকরুণ
াত্মপ্রসাদ ওর মনের মধ্যে আত্মবিকাশ করছে; ক্রুর একটা সর্পী ফনা তুলে
:শিত বস্তুকে দেখছে চেয়ে।

—বেশ রেঁধেছিস্ লো বৌদি! পাত চেটে ভাত খাবো! আমাদের
বৌটা রাঁধতে জানে না একবারে।

মিলন হাসলো শুধু। রাধা বলল—আমার উ এলে একদিন তুর হাতের
ান্না খাইবো।—আচ্ছা!—মিলন তাড়াতাড়ি ভাতগুলো গিলছিল—
কাথায় যেন কি ত্বরা রয়েছে ওর। হঠাৎ উঠে পড়ে বলল—ঠাকুরঘর বন্ধ
রেছি তো লো—দেখে আসি—খা তুই!

বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে মিলন দেখলো, ঠাকুর ঘরের দরজা নয়
-নন্দকে! বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে!—বাঃ কাবার! তার রূপ
াবং যৌবন দিয়ে অন্ততঃ একটা লোককে ঘায়েল করতে পেরেছে মিলন।
তার নব যৌবনের কঠিন সার্থকতা—তার অপমানিত নারীত্বের নিষ্ঠুর
ংশন!—আশ্চর্য্য একটা আনন্দ বোধ হচ্ছে, যা মিলন আর কোনো দিন
অনুভব করে নি।

ফিরে এসে আবার খেতে বসল। রাধা বললো—সেই রসের বইটো
কখন পড়বি লো?—রাতে শুবি আমার কাছে এসে—তখন পড়বো!

—না ভাই! জেঠা থাকলে পেটখুলে হাসতে পাব না, শুনতে পাবে
য। আখুন পড়িবি না!—না—জেঠা তো ঘরেই আছে, শুনতে পাবে।
—নে, খেয়ে নিয়ে চল শোব একটু। বড্ড ঘুম আসছে।

সত্যি ঘুম আসছে মিলনের। তার জীবন যেন সার্থকতায় ভরে উঠেছে, আর কিছু করবার নাই—একটা ছোঁড়াকে অন্ততঃ আঘাত করতে পেরেছে ও তার শাণিত দেহের তরবারি দিয়ে—এবার মিলন ঘুমুতে পারে—মরে গেলেও ক্ষতি নাই।

রাধাকে বিদায় করে দরজা বন্ধ করে মিলন আর একবার দেখলো নন্দকে—বিড়ি খাচ্ছে। নিজের ঘরে এসে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল মিলন!

অপরাহ্ন! সুদাস জেগেছে—তামাক টানছে কিন্তু মিলন এখনো শুয়ে। আহা, ঘুমুক। কাল সারাটা রাত জেগেছে মেয়েটা! সুদাসের অন্তর করুণায় দ্রবীভূত। মিলনকে ডাক দিল না—উঠে উঠানে এলো। নন্দ কোথায় বেরিয়ে গেছে—গাঁয়ে বেড়াতে গেছে হয়তো। সুদাস এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, পুঁইলতা, লাউগাছ, ঝিংএ, উচ্ছে—মিলনের হাতের কৃষিশিল্প। গাছগুলো কেমন সুদৃশ্য করে লাগানো—লাইন দিয়ে একেবারে। শিল্পদৃষ্টি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না মিলনের। নরুর সমাধিটার কাছে তুতিনটে চন্দ্রমল্লিকা আর রজনীগন্ধার গাছ—ফুল ফুটবে এবার···কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। গন্ধে উঠোন ভরে ভরে উঠবে। আহা, অভাগী মেয়ে, এই সব নিয়েই বেঁচে আছে। ঐ সমাধির স্মৃতিই ওকে জীইয়ে রাখে—আহা।

নন্দকে নেবে না মিলন। নন্দকে কেন, কাউকেই নেবে না। নরুকেই ভালোবাসে আর ঐ মহাপ্রভুকে! থাক—কাজ নাই, ওর যেমন ইচ্ছে থাকুক! সুদাস একখানা দানপত্র তৈরী করবে কালই, ঠাকুরের সেবাইত নিযুক্ত করে দেবে মিলনকে আর জমি-বাড়ীও দান করে দেবে। সুদাসের ভিটেতে মিলনই সন্ধ্যা জ্বালবে!

নিশ্বাসটা চাপতে পারছে না সুদাস। কণ্ঠিবদল করলেই ভাল হোত ওর। এত বড় জীবনটা সামনে। নন্দকে নেবে না, কিন্তু সুদাস দেখে শুনে একটা ভাল ছেলে···

—রোদে দাঁড়িয়ে কেন বাবা! মিলন দরজা খুলে প্রশ্ন করলো। সুদাস সস্নেহে বলল—না মা, রোদ পড়ে এল। নন্দকে কি বলে বিদায় করি মা! ওকে ডেকেছিলাম তোর জন্তেই।—ও সব আর করো না বাবা—বড্ড বোকা হচ্ছ তুমি! বলে দাও যে ঝুলনের সময় এসে যেন কাজকর্ম দেখাশোনা করে—শিষ্যসেবকদের আদর অভ্যর্থনা করে এই জন্ম ডেকেছিলে!

ঠিক! এতো সোজা উপায় রয়েছে, আর সুদাস ভেবে খুন হচ্ছিল! আশ্চর্য্য কিন্তু বুদ্ধি বৌমার আমার—মনে মনে ভাবলো সুদাস! মিলন গৃহকাজে মন দিয়েছে। এঁটো বাসন ধুলো, ঝাঁট দিল—আরো কত কি টুকিটাকি কাজ সেরে চলে গেল পুকুর ঘাটে কলসীটা কাঁখে নিয়ে! গা ডুবিয়ে অঙ্গ মার্জ্জনা করে জল নিয়ে যখন ফিরে এল, দেখলো—নন্দ নিজেই চা তৈরী করছে রান্নাঘরে। সুদাস মন্দিরের দাওয়ায় বসে। ভিজে শাড়ীর তলায় মিলনের পুষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, উজ্জ্বল বর্ণ আর চলার ছন্দ নন্দকে নির্নিমেষ করে দিয়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। মিলন দেখলো—মুখের আনন্দোচ্ছ্বাসটা গোপন করে ঘরে ঢুকলো গিয়ে। জলের কলসী রেখে যে শাড়ীটা পরে বেরিয়ে এল সেটা মিলন যাত্রা শুনবার দিন পরে যায় শ্বশুরের সঙ্গে!—চলুন! যান বসুন গে! চা করে দিচ্ছি, আমি—মিলন উনুনশালে এসে বলল।—বসি একটু! কী চমৎকার দেখতে লাগছে বৌদি—গায়ে গন্ধ কিসের, সাবান? নন্দ শুঁকতে আসছে!—ধেৎ! অসভ্য! মিলন ভ্রূকুটি করে সরে গেল; কিন্তু নন্দ ওর ঘাড়ের উপর নাকটা ঘষে মুখ দিয়ে শব্দ করলো—"চুক"। ভীষণ রাগ হচ্ছে মিলনের, কিন্তু মুখের হাসিটা লুকুতে পারছে না। আঁচল চাপা দিয়ে বলল—ডাকবো বাবাকে! দেব বলে—কিসব করছেন!—ডাকো কেনে গো সই—উ সব ভিরকুটিকে কি আমি ডর করি—বেদে জানে কুন সাপের "চুক"···বিষ কতটো—"চুক"!—বার বার তিনবার, পিঠে, হাতে বুকের কাছটায়!

—জানেন না—জানিয়ে দিচ্ছি বেদেকে—বলে সবেগে বেরিয়ে এল মিলন। সুদাসের সাম্‌নে এসে বলল—এই অসভ্য ইতরটাকে কেনো তুমি ডেকেছ বাবা! বার করে দাও নইলে—কেঁদে ফেল-ল মিলন।

আহত শার্দ্দুলের মত গর্জ্জন করে উঠলো সুদাস! এ যে তার প্রিয়তম পুত্রের অপমান, পুত্রের প্রিয়তম সতী পত্নীর অপমান। সুদাস জানতে পর্য্যন্ত চাইল না কি ঘটেছে। বলল, নন্দ! ঝুলনের সময় তোমাকে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু না তুমি চলে যাও···এসো না আর কখনো।

উঠে এসে সুদাস মিলনের কান্নাভরা মুখখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। বাচ্চা মেয়ে যেমন করে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে লজেঞ্চুশ না দিলে, মিলন ঠিক তেমনি করি কাঁদছে! কোঁচার খুঁটে ওর চোখ মুছে দিতে দিতে সুদাস আবার বলল—যাও নন্দ!

—কিছুই বলি নাই কাকা···এমন কিছুই না···

—চোপ রও শয়তান—ফের কথা বললে গুঁতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব। যাও বেরও বলছি!

অদ্ভুত! এমনটা ঘটবে, নন্দ একবারও আশা করে নি। নিঃশব্দে গামছা কাপড় নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। যাক! খুনী মাধব এমন করে সুদাসের পুত্র পুত্রবধূর অসম্মান করে নি—সুদাসের বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ করতে আসে নি—মাধব অনেক ভালো এর চেয়ে। মিলনের চোখমুখ মুছে দিয়ে সুদাস অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল—যামা, আর আমার ভুল হবে না—তুই সতী তুই শ্রীমতী রাধা! সুদাসের কোল থেকে মুক্ত হয়ে মিলন রান্নাঘরে এসে দেখলো—চা-চিনি-ছাকনি ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। সেই বাঁকা হাসিটাই আবার হাসলো মিলন।

কলকাতায় এসে মাধবের অন্তর আরো বিষাদ হয়ে গেল। কোথাও স্বস্তি নেই—যেখানে যায়, পুলিশ। রাস্তায় ঘাটে যেখানে পুলিশ দেখে, মনে হয়, ঐ বুঝি ধরতে আসছে। সকাল বেলায় একটা খোলার চালওয়ালা

দোকানে চা খায়। একখানা খবরের কাগজ কেনা হয়, দোকানের খদ্দেরদের জন্য। মাধব প্রথমেই দেখে, কোথায় কটা চুরি ধরা পড়েছে, খুনের মামলায় রায় বেরিয়েছে কিনা—শাস্তিটা কতখানি হোল। কোথায় রাহাজানি, কোথায় লুঠতরাজ হচ্ছে, আর কলকাতার বাহাদুর পুলিশ কি ভাবে চোর ধরছে—চটপট খবরগুলো পড়েই পাশের লোককে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—ভাবে, এবার ওর পালা। ওকেও ধরলো বলে!

চারদিকে খাদ্যাভাব—জিনিযের দাম চারগুণ ; তাও পাওয়া যায় না। মহা মুস্কিল। এদিকে মাধবের সঞ্চিত সম্বল ফুরিয়ে এল। কাজ একটা যোগাড় না করতে পারলে অনাহারে মরে যেতে হবে। এখানে তো আর মিলনরাণী নাই যে, রাত দুপুরে আদর করে খাইয়ে পুরু বিছানা পেতে ঘুমুতে দেবে!

ঐ আর এক জ্বালা হয়েছে। মিলনের কথাটাই অহরহ জাগছে মনে। একবিন্দু সময় হয়তো পার্কে বসে বিড়ি টানছে—একটা তন্বী মেয়ে যাচ্ছে, অমনি মিলনের রূপ ভেসে এল মাধবের মনে। কোনো মেয়ে না এলেও মিলনের মুখ তার চোখের সামনে জ্বলছে যেন! পুলিশের ভয় না থাকলে মাধব মিলনের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতো না হয়তো! উল্টে-পাল্টে মিলনের কথাগুলি ভাবে—ভাবে আর মনে হয়, কী বোকামিই না করেছে! শৈলীর সঙ্গে অতকাল মিশেও মাধব মেয়েদের মন বুঝতে পারে নি। নিজকে বারবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়। বারবার নিজেই বলে—সে একটা নপুংসক! নির্বোধ।

আজ সকালে মাধব ট্যাক খুলে টাকা পয়সা গুণে দেখলো দুটাকা সাড়ে চার আনা—এ আর কতক্ষণ! আজ আর কাল বই চলবে না। মাধবের ভাবনাটা অকস্মাৎ মিলনের কথা ছেড়ে খাদ্যের দুর্মূল্যতার কথা এবং সেটা যোগাড়ের কথা ভাবতে লাগলো। গানবাজনা ছাড়া কিছুই শেখে

নি মাধব। চেষ্টা করলে সেই কাজই একটা পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু কাজ খুঁজতে গেলেই যে বিপদ! পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে—কোথ কাজ করেছে, প্রশ্ন করবে—হাজার হাঙ্গামা! এদিকে মাধবের নামে হুলিয়া রয়েছে—কোনোরকমে একবার জানতে পারলে—একেবারে আন্দামান!

একটা নাপিত দাড়ি কামাচ্ছিল—মাধবও কামিয়ে নেবে নাকি! দাড়িটায় হাত দিয়ে দেখলো—কদিনে বেশ বড় হয়েছে। কিন্তু মুখের পরিবর্তনের জন্য চুল রেখেছে—দাড়িও তো রাখতে পারে! বেশ হবে দাড়ি আর কামাবে না মাধব!

কিন্তু দাড়ি না থাকার জন্যই সেদিন বেঁচে গেছে। মিলনের শাড়ী পরে বৌ সাজতে পারলো দাড়ি না থাকার জন্যই তো! না হলে—মিলনের শাড়ী, আর মুখে একমুখ দাড়ি—সে কেমন হোত!—হাসি পেয়ে গেল মাধবের। হাসলো!

পথে যেতে যেতে খামোখা হাসলে অন্য পথচারীরা সন্দেহ করতে পারে, মাধব কষ্টে সম্বরণ করলো হাসিটা! এটা ওর একটা রোগ। মনে মনে অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে ও বহুসময় হেসে ফেলে—নাঃ এবার থেকে সামলে চলতে হবে!

কলেজ ষ্ট্রীট ধরে যাচ্ছে মাধব বৌবাজারের দিকে। কোথায় যাচ্ছে কিছু ঠিক নাই; কলকাতার রাস্তা ওর সুপরিচিত; বহুদিন থেকে কলকাতায়। কিন্তু বন্ধু বা বান্ধবী আছে বলে তো মনে পড়ছে না। আছে যার, তারা সবাই শৈলীকে চেনে অধিকারীকেও। সেখানে গিয়ে মাধব কি ধরা পড়বে। ধরিয়ে দিলে করবে কি মাধব! তাদের কারু সঙ্গে দেখা হয়, এটা মাধব চায় না! তাই উঠেছে এসে নার্সিং লেন নামক একটা ছোট্ট গলির একটা অতি ছোট হোটেলে। সেখানে কেউ তাকে চেনে না, খায় আর শুয়ে থাকে বাইরের একখানা চৌকীতে। তাতেই পাঁচসিকে

করে নেয় রোজ ! তবে নিরাপদ—পুলিশ ওখানে যায় না ! যায় না আবার ! কলকাতার পুলিশ কোথায় না যায় ! খোঁজ পায় নি তাই !

ঘড় ঘড় করে একখানা ট্রাম আসছে। মাধব চেয়ে দেখলো আরোহীগুলোকে—লোকে ঠাসা—বসে—দাঁড়িয়ে, হাতল ধরে ঝুলে চলেছে সবাই। হঠাৎ একখানা মুখ নজরে পড়লো। মারুতী সরকার যাচ্ছে ফাষ্ট ক্লাসের একখানা বেঞ্চে বসে। অবিলম্বে মুখখানা ফিরিয়ে মাধব পাশের গলিটায় ঢুকে পড়লো। ছুটছে যেন। আর একটু হলেই দেখে ফেলেছিল আর কি ! ট্রামলাইনওলা রাস্তায় মাধব আর হাঁটবে না !

অনেকখানা এসে বুকের ত্রুকত্রুক ভাব কমলে মাধব ভাবতে লাগলো ঐ মারুতী সরকারের কথা। লোকটা কাপ্তেন। মাঝে মাঝে এমেচার থিয়েটারের দল গড়ে ! ভাড়াটে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে বলে ভদ্রলোকের মেয়ে-বৌ। দু'একটা মেয়ের আবার স্বামী খাড়া করেও দেয় দলের কোনো পুরুষকে ! বলে, ঐ সুমেনের বৌ ইতি, শ্রীমতী অমুক। দিনকতক মহড়া দিয়ে চ্যারিটি শো করে—ইন্ এড্ অব্···যাহোক একটা কিছু। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, যক্ষা-হাসপাতাল যাহোক একটা কিছুর হুজুগ তুলে বেশ দু'পয়সা কামায়।

মাধব ওর দলে দুবার গিয়েছে ; একদফা—নদীয়া বিনোদ পালায় নিমাই সাজে আর একবার চন্দ্রগুপ্ততে চন্দ্রগুপ্ত ! খুব খাতির পেয়েছিল। মেয়েগুলো মাধবদা বলতে অজ্ঞান। লুকিয়ে ওর জন্য চা জলখাবার এনে দিত। মাধবদের দল বাইরে চলে যাওয়ার পর মারুতীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি ! ওর এমেচার থিয়েটার আর ভদ্রঘরের মেয়েগুলি কেমন আছে দেখে এলে হয়। কিন্তু সর্বনাশ ! ঐ মারুতী লোকটা কম পাত্র নয় ! মাধবকে ধরবার জন্য নিশ্চয় পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মারুতী সে পুরস্কার নিশ্চয় আদায় করবে মাধবকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিয়ে। পয়সার জন্য মারুতী তার বাবাকে গ্রেপ্তার করাতে পারে ! যে মেয়েটি মারুতীকে

পরিচালন করে, সে থাকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা দোতালা বাড়ীতে। মারুতীর থিয়েটারে সেই চিরকাল নায়িকা হয়ে আসছে!

জিজ্ঞাসা করলে বলে—আমি হাফ্ গেরস্থর মেয়ে—বাবা আছে, মা আছে, ভাইও! নিজে কিন্তু মারুতী অভিনয় করে না। মোটা শরীর আর গলাটা মোটে ষ্টেজ স্যুটিং নয়, তা ছাড়া মাতব্বরী করাই তার কাজ আর পয়সা কামানো—অভিনয় করবার দরকার কি! অভিনয় করার চাইতে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করাটাই পছন্দ করে ও; তাছাড়া বিস্তর চেনা লোককে কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড দেয়। বিনিপয়সার কিছু পেলে বাঙালী মেয়েবৌরা আসবেই। মারুতী তাদের আদর অভ্যর্থনা করে, বসিয়ে দেয়—চোখে দেখতে পায় অপার্থিব নারীরূপ, একআধটু ছোঁয়াও যায়! মারুতীর কাছে গেলে মাধব এখুনি চাকরী পেতে পারে। এমন কি, মারুতী তাকে দেখতে পেলেই হয়তো পাকড়াও করবে কিন্তু ধরিয়েও দিতে পারে—না, মাধব ও পথ মাড়াবে না!

যে গলিটায় ঢুকেছে, চেয়ে দেখলো—বিখ্যাত বারনারীদের পাড়া। মোড়ের মাথায় শিব মন্দির রেখে গলিটা নিজেকে অভিজাত করে তুলেছে। হাসি পেল মাধবের! না হাসবে না আর! মাধব চলতে লাগলো হনহন করে। গলিটা পার হলেই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—মারুতীর হাফ্ গেরস্থ বৌ এর বাড়ী। সে চেনে মাধবকে। একবার গেলে কেমন হয়! মারুতী তো গেল লালবাজারের দিকে! এই সময় একবার মাধব গিয়ে দেখবে নাকি! নিজের অজ্ঞাতসারেই মাধব গলিটা পার হয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পড়ল! ঐ যে বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। রেডিও বাজছে দোতলায়। মারুতীর সুখের পায়রা—বাজবে না!

মাধব দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। নীচের তলায় বুরুষের দোকান—দোতালায় থাকেন সেই ভদ্রমহিলা। একটা ঝি বেরিয়ে আসতেই মাধব বলল—ইন্দু বাড়ীতে আছে?

—হ্যাঁ ! ওমা—তুমি ! মাধব ? কোথা থেকে আসছো ! দাঁড়াও খবর দি !

ঝি আবার ভেতরে ঢুকলো। ঝির খাতির করা দেখে ভয় পেয়ে গেল মাধব ! তাহলে এরা কি জানে নাকি তার খুনখারাপীর কথা। যদি ধরিয়ে দেয় ! মাধব অন্তরে কেঁপে উঠছে—চলে যাবে কি না ভাবছে ; উপরের একটা জানালায় মুখ বাড়িয়ে ইন্দু স্বয়ং বলল—এসো মাধবদা—এসো, এসো, উঠে এসো ! কেমন আছ ভাই ?

—ভালোই। তোমরা সব ?

—এসো উঠে এসো, ঘরে এসে কথা বলবে।

যাবে কি না ভাবছিল মাধব ; যাওয়াই স্থির করলো। উপরে উঠতেই সাদর অভ্যর্থনা করলো ইন্দু ! শৈলীর খবরটাই আগে জিজ্ঞাসা করলো ! মাধব বুঝলো, শৈলীর মরার কথা এরা জানে না। নিশ্চিন্ত হয়ে বসল মাধব এতক্ষণে !

—মাক্তীদাকে দেখলাম, ট্রামে যাচ্ছে—গেল কোথায় !

—ড্রেসিং টেবিল কিনতে গেল বৌবাজার। তোমায় বুঝি ওকে দেখে আমাদের কথা মনে পড়ল ?

—না ! তা নয়। সবে দিন পাঁচসাত এসেছি কলকাতা। একটা কাজ কর্মের চেষ্টা করছি।

—দল ছেড়ে দিয়েছ নাকি ?

—হুঁ—অনেক দিন। অমন করে দেশে দেশে ঘোরা পোষায় না ভাই ইন্দু !

—ঠিক কথা। শৈলীকে কোথায় রেখেছ ?

—শৈলী তার জায়গাতেই আছে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বইতো নয় ?

—ওঃ হ্যাঁ—খালি বন্ধু ! তা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ?

—ধরাধরিই করে ছিল যে ছাড়াছাড়ি হবে? মাধব প্রতি প্রশ্ন করে এড়াতে চাইছে!

—ছিল না নাকি?—বলে মুখ মটকে হাসলো ইন্দু। খাও, চা খাও। আসুক ও, তোমার কাজের ভাবনা কি! আজই তো একটা প্লে আছে দুর্ভিক্ষের সাহায্যে···বাজাবে তুমি একটা সানাই—না হয় আড় বাঁশী। দশটা টাকা তো নিশ্চয়!

মাধব সত্যি গুণীলোক—একথাটা মাধবই যেন ভুলে গিয়েছিল এত দিন। সত্যি তো! এত সহজে সে অর্থার্জন করতে পারে—ভাবছে কেন!—এতক্ষণে মনটা যেন ওর খুব হাল্কা হয়ে গেল। পুলিশের ভয় নাই, টাকার অভাব নাই—আর কি চাই! চায়ের কাপটা মুখে তুলতে তুলতে তাকালো ইন্দুর দিকে। রোগা ইন্দু বেশ একটু মোটা হয়েছে কিন্তু দেখতে আরো সুন্দরী হয়েছে। গোল গোল চোখদুটো অত্যন্ত উজ্জ্বল ···মুখের চামড়া মোটা হওয়ার জন্য টানটান হয়ে আরো রং খুলেছে। রীতিমত সুন্দরী এখন ইন্দু!

—কি প্লে হবে? মাধব কৌতূহলটা আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না!

—"তর্পন"...এই দুর্ভিক্ষে যারা মরলো না—তাদের কথা নিয়ে লেখা বই। বেশ বইটা!

—কে লিখেছেন? মাধব আবার প্রশ্ন করলো!

—উনি নিজেই। খুবই ভালো হয়েছে। দেখো এখন! ঐ পার্কের ধারে অনেক লোক মরেছে কিনা···উনি সেগুলো দেখেছেন। এমন চমৎকার করে লিখেছেন উনি!

ইন্দুর উনি আবার বই লেখে! আশ্চর্য্য হয়ে গেল মাধব! 'উনি' মানে মারুতী তো—না আর কেউ? আজকাল ভদ্রশিক্ষিত মেয়েরা স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছে—আর এই সাজানো ভদ্র হাঁফ্‌গেরস্তরা উপপতিকে উনি বলতে আরম্ভ করলো—বাঃ হাসি পাচ্ছে

আবার মাধবের। ইন্দু বলল—বিশ্বেস করছো না মাধবদা—সত্যি উনি লিখেছেন।

—হ্যাঁ, বিশ্বেস করবো না কেন? আমাকে একটা পার্ট দিতে পার না!

—আজই অভিনয়; মুখস্থ করবে কখন! এর পরেরটায় পার্ট নিও। তার নাম দিয়েছেন মৃত্যু-বিলাস। ভারী সুন্দর হয়েছে বইটা! বেশতো তুমিই নায়ক অচ্যুত হবে; আমি তো ঠিকই আছি—এনাক্ষী দেবী। তোমাতে আমাতেই তো নায়ক আর নায়িকা হয়েছি ভাই বরাবর—হাসলো।

ইন্দু একটু থেমে বলল—সেই যে নদীয়া বিনোদে গৌরাঙ্গ হয়ে গৃহত্যাগ করে গেলে না, তারপর তোমার জন্তে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে আমার হা-পিত্যেশ করে কান্না—আহা, বেশ মনে আছে! যাবার আগে আমাকে কত আদর করে ফুলের গয়না পরালে—সেই তুমি গেছ ভাই, তারপর এই আজ এলে—বাপ্! অমনি করে আবার ভুলে যেতে হয়—ছিঃ আপনার লোক!

মাধবের মজাই লাগছে। আপনার লোক! সত্যি নাকি! ইন্দু তাকে আপনার লোক মনে করে! আশ্চর্য্য তো! কিন্তু ইন্দু একটা গরম সিঙ্গাড়া ভেঙ্গে মাধবের মুখে গুঁজে দিয়ে বলল—খাও!

অকস্মাৎ মাধবের মনে পড়ে গেল সেদিনের রান্না। মিলনের মুখে ভাত গুঁজে দেওয়া—মিলনের হাত ধরে ভাত খাওয়া। সিঙ্গাড়াটা গলছে না গলা দিয়ে আর। ইন্দু তাগাদা দিয়ে বলল—খাচ্ছ না যে মাধবদা? বাকি আধখানা সিঙ্গাড়া হাতে তুলে নিয়ে মাধব ইন্দুর মুখে গুঁজে দিতে দিতে বলল—তুমিও খাও তবে তো!—হেসে হাতের আঙুলে কামড়ে দিল ইন্দু! কে যেন চাবুক মারলো মাধবের পিঠে। ধিক্ ধিক্, সেই সময় কুণ্ঠিতা মিলন, আর এই হারামজাদী ইন্দু! এই হাত দিয়ে মিলনের

মুখে খাবার তুলে দিয়েছে মাধব—আজ সেই পবিত্র হাত ইন্দুর মুখে দিতে ওর লজ্জাও করলো না! মাধব আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ! ইন্দু নিজের মনেই বকে চলেছে। নায়িকার অভিনয়টা এখনো করছে যেন মাধবকে নিয়ে। কিম্বা, অভিনয় করছে না—সত্যি কথাগুলোই বলে যাচ্ছে। মাধব কানই দিচ্ছে না। মারুতী এল! কুশল আদান প্রদান চুকলে বললো—তা ভালই, আজ থেকেই লেগে যাও।

আন্দাজটা ঠিকমত অনুভব করতে পারছে না মাধব—কাঁটার মত কোথায় যেন বিঁধছে কি একটা। মারুতী নিশ্চয় বিজ্ঞাপন লটকে দেবে—বাঁশী শ্রীমাধবদাস দাসবৈষ্ণব—মুস্কিল হয়ে যাবে তাহলে। বলল—আমার নাম প্রচার করো না মারুতীদা—তাহলে ঐ অধিকারী শালা ধরে নিয়ে যাবে। কিছু টাকা ধার আছে আমার। তোমার এখানে রোজগার করে শোধ করে দেব!

—টাকা ধার আছে তাতেই ধরে নিয়ে যাবে—ইয়ারকি নাকি—মারুতী সরোষে বলল।

মাধব বিপদ গণলো—আমতা আমতা করে বলল—কেলেংকারী করতে চাই না মারুতীদা—লোকজানাজানি হবে যে মধিব ধার করেছে—তার চেয়ে পোষ্টার দাও—"বাঁশী—বেণু-বাদক—" অনুপ্রাস দিয়ে বলল কথাটা মাধব! পছন্দ হচ্ছে মারুতীর, অতঃপর তাই ঠিক হল! মারুতী আবার বেরিয়ে গেল। তার আজ অনেক কাজ। ইন্দু একটা বাঁশী এনে বলল,—একবার অভ্যেস করে নাও মাধবদা। আমিও শুনি একটু! বলে মাধবের কোলের কাছে আড় হয়ে শুলো—ঠিক যেন কেষ্টর কোলে রাধা আঁকা থাকে বটতলার পটে!

অভ্যাস করা দরকার একবার! মাধব বাজাচ্ছে বাঁশীটা—ইন্দুর ঢুলুনি আসছে! মুখখানায় কেমন একটা বিলাস-সংকেত—সর্বাঙ্গে একটা

আশ্লেষ-আকুতি। মাধবের কোলে একটা হাত তুলে দিয়ে বললো—আহা বড্ড ভালো লাগছে!—বলেই মাথাটা তুলে দিল কোলে।

মাধবের চোখে একটা যাদু-প্রভাব, শিরায় একটা সম্মোহন সঞ্চরন করছে। বাঁশী নামিয়ে মাধব হাত দিল ইন্দুর থুত্‌নিতে, তারপর যেই না নিজের মাথাটা নোয়াতে যাবে, ইন্দু চোখ খুলে লাফিয়ে উঠলো—ওকি মাধবদা, ছিঃ উনি কি মনে করবেন!—বলেই ফিক্ ফিক্ করে হেসে কাপড় চোপড় সামলাতে সামলাতে বলল—তুমি বড্ড লোভী মাধবদা—ছি!

—ছিঃ—এই ধিক্কার মাধব আজ সহ্য করতে পারছে না। শৈলীর কাছে সে ধিকৃত হয়েছে, মিলনের অন্তরের অপকট আবেদনকে অগ্রাহ্য করে ধিকৃত হয়েছে—আবার ইন্দুর এই ছিঃ যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল মাধবের মাথায়। মাধব দুহাত বাড়িয়ে ধরতে গেল ইন্দুকে, কিন্তু ইন্দু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখ গম্ভীর করে বলল—হয়েছে আর বাহাদুরি করতে হবে না—বসো ঐখানে!

ইন্দু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কতক্ষণ বসে আছে মাধব, কে জানে—কার কথা ভাবছে, তাইবা কে জানে—হয়তো কিছুই ভাবছে না—পুলিশের কথাও না। মারুতী ফিরে এসে ডাকলো—চলো হে, খাবে!—মাধব উঠে গিয়ে খেতে বসল। ইন্দুই পরিবেশন করছে। সিল্কের জংলাশাড়ী পরণে। হাতে কয়েকগাছা বেশী চুড়ি, গলার হার আর লকেট নতুন ধরণের, তাছাড়া কোমরে একটা সোনার বিছেহার—এগুলো এরমধ্যে কখন পরেছে ও। ঝলমল করছে সর্ব্বাঙ্গ। বাহুতে যে আর্মলেট্ পরেছে তার গড়ণটা অভিনব—সোনার কয়েকটি অজন্তা মূর্ত্তি হাত ধরাধরি করে ওর হাতের উপর নাচছে।

—মাধবদা আবার কাঁচা লঙ্কা না হলে ভাত খেতে পারে না—জানো তো—এই নাও মাধবদা···বলে বড় একটা কাঁচালঙ্কা দিল মাধবকে! মুখের হাঁটা ওর একটু বেশি প্রশস্ত—হাসিটা তাই আকর্ণ বিস্তৃত হয়—

হেসে আবার বলল—শৈলী কিরকম বাঁধে মাধবদা! —মাধব উত্তর দিতে চোখ পর্য্যন্ত তুললো না—বলল—মন্দ নয়!

—আজ বাঁশীতে সাপ ডেকে আনতে হবে তোমায়। তবে বুঝবো, গুণী!—বলল ইন্দু আবার। নিরুত্তরে খেয়ে চলল মাধব। মারুতীও খাচ্ছে ঐ সঙ্গে। মাধবের ভাবগতিক দেখে বলল—কথা বলছ না কেন, মাধব। তোমার জন্য ইন্দুর সাজটা চেয়ে দেখ একবার!

—ওরা উর্ব্বশীর জাত। ব্যক্তির জন্যে সাজ করে না—সমষ্টির জন্যে করে! বলে মাধব খাওয়া শেষ করে। ওর কথাটা ইন্দু তো বুঝলেই না, মারুতীও না! মাধব ওকথাটা কোন্ লেখকের বই থেকে ধার করেছে। এরকম ধারকরা যাকে বলে টুকনিফাই—সেটা মাধবের ধাতুগত হয়ে গেছে।

খেয়ে খানিক ঘুমুলো মাধব একটা নির্জন ঘরে খিল এঁটে। সন্ধ্যায় উঠলো! মারুতী বলল—সারাদিন ঘুমুলে, চলো এখন—সাতটায় তোমার বাঁশীর প্রোগ্রাম!

এক গাড়ীতে ইন্দু-মারুতী-মাধব এসে পৌছাল থিয়েটার হলে! ইন্দুর সাজটা এখন আরো সুন্দর। মাধব তার পানে চেয়ে খাবার সময়ে বলা কথাটার সত্যটা বুঝতে চাইছিল! নিঃশব্দে বসে রইল বরাবর! ঠিক সাতটায় তার বাঁশী বাজানো আর একটি কীর্ত্তন গান চুকিয়ে দিল—ভালোই বাজালো—প্রশংসা করলো সবাই। পর্দ্দা পড়তেই মাধব উঠে মারুতীর কাছে গিয়ে বলল—বড্ড হাত খালি যাচ্ছে—টাকাটা যদি দাও! মারুতী দশটাকা বাঁশী বাবদ আর পাঁচটাকা একটা কীর্ত্তনগান বাবদ দিল মাধবের হাতে। মাধব বলল—আমি একটু আসছি—আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এল!

উঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন মাধব। তার জন্মজন্মের অর্জ্জিত তপস্যাকে ঐ স্বর্গ-নটী ইন্দু ভঙ্গ করতে যাচ্ছিল যেন। যেন, মহাপাপে ডুবিয়ে

মাধবকে রসাতলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। ওর উনিকে নিয়েই ও থাক—মাধব ওর ছায়াও মাড়াবে না; আর ওদের—ঐ হাফ্‌গেরস্থ ভদ্রদের।

কি যেন অপার্থিব বস্তু—নিষ্কলুষ প্রেম—মাধবের অন্তরকে অমৃতময় করে দিচ্ছে! বেশ্যার প্রেম আর বধূর প্রেমে যে কতখানি তফাৎ—তা মিলনের ঐ একটি কথাতেই বুঝেছে মাধব—"আজকার রাতটা থেকে যাও লক্ষীটি—" আহা, কি সুধাসিক্ত আবেদন! মিলনের অন্তর দুয়ারে ভিখারী হতে চলেছে মাধব। হোটেলে এসে ঝোলাটা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ষ্টেশনের পথে! সাড়ে নটায় ট্রেণ ধরতে পারলে ভোর চারটায় নামতে পারবে ষ্টেশনে—নদী পার হয়ে যাবে সাঁতরে—তাহলে অন্ততঃ পাঁচটায়--খুব ভোরেই গিয়ে দেখতে পাবে মিলনকে—মিলন—মিলন—মিলন!

ক'দিন থেকে মিলন ভাগবত পাঠ সুরু করেছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অর্থ বোঝে সুদাসের কাছে। না বলে দিলে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান জানায়। রাধা এসে ফিরে যায়—ওসব কথার মানে বিশেষ বোঝে না রাধা। সুদাস সন্ধ্যায় অর্থ করে দিচ্ছিল ভাগবতের—রাধা এল!

—ঝুলন এবার কোন্ তারিখে জেঠা? রাধা শুধুলো কথার মাঝখানে!

—বাইশে শাওণ···সুদাস জবাব দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। মিলন পুঁথীখানা বন্ধ করে বলল—কি ভাবছো বাবা? টাকাকড়ির কথা!

—হাঁ মা। একবার শিষ্য সেবকদের বাড়ী ঘুরে আসতে হবে। তা রাধা তোর কাছে দুটো দিন থাকুক—আমি ঘুরে আসি গে। নাহলে তো ঝুলনের খরচ জুটবে না মা!

—বেশ তো বাবা! রাধা থাকে ভালোই। নাহয়, আমি একাই থাকতে পারবো। আজকাল আর আমার ভয় লাগে না! আমি এখন বড় হয়ে গেছি বাবা—মিলন হাসলো!

—হয়েছিস নাকি?—সুদাসও হাসলো। নদীর বানটা মাঝখানে

কমেছিল, আজ আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ একমাত্র ভয় সুদাসের—বললো,—হঠাৎ যদি বান উঠে যায় মা—ঠাকুরকে তো সরাতে হবে।

—তোমার কিছু ভাবনা নাই বাবা,—রাধা আর আমি সরিয়ে নেব—কি বলিস রাধা?

মিলন রাধার পানে তাকালো। রাধাও সমর্থন করলো—বললো—তা সরাতে পারবো না কেনে। বান উঠবার সম্ভাবনা এখনো নাই। তমাল গাছতলা বা নরুর সমাধি অবধি বান উঠতে পারে, তার বেশী বান উঠলে গাঁয়ের অর্দ্ধেক ডুবে যাবে—জানে সুদাস! তবে মন্দিরের পিছনে বা গাড়ীচলা রাস্তার খালমত যায়গা—ঐতে বান ঢুকে মন্দিরের ক্ষতি না হয়।

কিন্তু সুদাসকে একবার বেরুতেই হবে। ঝুলনের পূর্ব্বে কিছু আয়োজন করতে হয়—তার জন্য টাকার দরকার। ঝুলনের সময় অবশ্য অনেকেই আসবে—প্রণামি দেবে—তাতে আয় মন্দ হয় না—কিন্তু তার আগের ব্যবস্থাটা করতেই হয়। অন্যান্য বছর মিলনকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সুদাস রাধার বাবার হাতে ঠাকুর পূজার ভার দিয়ে যেত—এবার মিলন বাপের বাড়ী যেতে চাইছে না! নরুর কথা মিলন এখন দিনরাত ভাবে—তাই নরুর স্মৃতিঘেরা ঠাইটুকু ছাড়তে চায় না—সুদাসের এই বিশ্বাস।

খাওয়া সেরে সুদাস নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো। মিলনও খাওয়া শেষ করে ঘর দোর গুছিয়ে নিজের ঘরে খিল দিল। রাধা কাল থেকে ওর কাছে শোবে, সুদাস যাবে শিষ্য বাড়ী—ঠিক হয়ে গেছে। রাধা থাকলে মন্দ হবে না। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা আজকাল খুবই জমে উঠেছে মিলনের। বিদ্যাসুন্দর বইখানা কিন্তু অপঠিত রয়ে গেছে—কারণ সুদাস আজকাল প্রায় সব সময় ঘরে থাকে।

সুদাস দিন দুই বাইরে গেলে মিলন আর রাধা বইটা শেষ করতে পারে! রাধার সঙ্গে ইঙ্গিতে সেকথাও হয়ে গেছে মিলনের।

কাল সকালেই সুদাস যাবে—আজ রাতটা কাটলেই যাবে সুদাস। এই কদিন সুদাসের সুমুখে ক্রমাগত অভিনয় করছে নরুকে ভালোবাসার। কত রকম করে যে সে অভিনয় করে মিলন, তার আর সীমা-সংখ্যা নাই। বলে,—কৈ বাবা, সেই ছবি তো এলো না। গৌরবাবুকে চিঠি লেখ—।

—আসবে মা কাল্‌পরশুই এসে যাবে!

একটা কাঠের চৌকী ধুয়ে মুছে মিলন চকখড়ি গুলে আলপনা এঁকেছে—রেখেছে নিজের ঘরে—সুদাস আসতেই বললো—ছবিটি এইটার উপর রাখবো! সুদাস শুধু খুশী হল বললেই যথেষ্ট বলা হয় না… খুসীতে কেঁদে ফেললো। মিলনের মস্তকঘ্রাণ করে আশীর্ব্বাদ জানালো সেদিন। নরুর খড়ম আর জুতোগুলো বার করে মিলন ঐ চৌকীটার তলায় সাজিয়ে রাখছে—সুদাস দেখে বললো—কী তুই করছিস মা মিলন! —অশ্রুটা সুদাসের নিশ্চয়ই আনন্দ দ্যোতনা করছে, জানে মিলন…মুখখানা নামিয়ে বলল—শ্রীভরতের আদর্শ আমার বাবা!

কান্নাটা ঢাকবার জন্য সুদাস গেল উঠোনে আর হাসি চাপবার জন্য মিলন উবুড় হয়ে পড়লো ঐ চৌকীর তলাতেই!—চলছিল এই সব কদিন!

কিন্তু মিলন ক্লান্ত হচ্ছে। এমন করে অভিনয় কারবার কিযে তার দরকার? ভাবতে গিয়ে মিলন আবিষ্কার করলো…দরকার আছে এই অভিনয়ের। সুদাস সেদিন ঘোর সন্দেহ করেছিল মিলনের উপর—ব্যাপারটাও সন্দেহজনক হয়েছিল। সুদাসের অন্তর থেকে সেই সন্দেহ মুছে গেছে কিনা, জানে না মিলন এখনো।

তাই এই অভিনয় করে চলেছে। কিন্তু আর পারে না মিলন। ক্লান্তিতে ওর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ এ অভিনয় করতে হচ্ছে সেই যে সেদিন দোতালার ঘরে অভিনয়টা করলো—তারপর থেকেই এটা করার দরকার হচ্ছে যেন। সুদাস চায়—মিলন এমনি করেই নরুকে

সুবোধ মিলন কখনো করেনি গৌরকে...আ

টার দিকে একবার সজল চোখে চেয়ে গৌর বলল,
ও! জলতলার দিকেই গেল গৌর। মিলন তাড়া-
নিয়ে এল—ছবিটা দেখবার বা বই খুলবার তার এখন
লনের হাত থেকেই নিল গৌর বাটিটা।
। কবে আসবে? শুধুলো গৌর।
বিকেলে! বলে মিলন দাঁড়িয়ে রইল। কী চমৎকার
পাথরের মূর্তির মত!
কে চা-টুকু শেষ করে গৌর বলল—দাস জেঠা আসুক,
সবো আবার!
থাকবেন?
দিন আট দশ—বলে গৌর বাটিটা নামিয়ে দিচ্ছিল, মিলন
নল। গৌর চলে যাচ্ছে—মিলন বলল—স্বদেশী হো অনেক
র বিয়ে করুন—হাসির রঞ্জন ওর মুখে!
! কনে' দেখবে নাকি তুমি?—হাসলো একরত্তি গৌরও—
খ—বলে সদর পার হয়ে গৌর বেরিয়ে গেল রাস্তায়, তার
া খালে নেমে লুপ্ত হয়ে গেল!
ভালো ছেলে, ওরা সৎ ছেলে, ওরা সুবোধ ছেলে—মিলনের
কথা বেশী কইলে ওদের বদনাম হবে—ভয়ে ভয়ে এসেছে,
পালিয়ে গেল—যেন চুরি করতে এসেছিল; না—পাছে চুরির
য, সেই ভয়েই পালালো!—যাক গে!
সদরটা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাঘরে এসে বইগুলো দেখতে
নতুন ডিটেকটিভ উপন্যাস—ছোট ছেলেদের জন্য লেখা বই—
বই-ই বরাবর আনে গৌর। মিলন যেন এখনো বড় হয় নি;